SAHITYA TATWA PRACHYA O PASHCHATYA

MA [Bengali]

Third Semester

BNGL 902C

Directorate of Distance Education

TRIPURA UNIVERSITY

Reviewer

Dr. Rejaul Karim

Professor of Allia University

Authors

Dr. Nityananda Mandal: Units: (I, II) © Reserved, 2016

Prof. Supriya Kumar Das: Units: (III, IV) © Reserved, 2016

Books are developed, printed and published on behalf of **Directorate of Distance Education, Tripura University** by Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

All rights reserved. No part of this publication which is material, protected by this copyright notice may not be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form of by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the DDE, Tripura University & Publisher.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: 7361, Ravindra Mansion, Ram Nagar, New Delhi – 110 055
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

সিলেবাস বই - ম্যাপিং টেবিল

সিলেবাস

প্রথম একক **(পৃষ্ঠা 1-22)**

সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র

দ্বিতীয় একক **(পৃষ্ঠা 23 - 56)**

সাহিত্যের পথে

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী

তৃতীয় একক **(পৃষ্ঠা 57 - 68)**

অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস

চতুর্থ একক **(পৃষ্ঠা 69 - 80)**

ক্লাসিজম

সূচীপত্র

প্রথম একক	**(পৃষ্ঠা 1-22)**	**টিপ্পনী**
সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র		
দ্বিতীয় একক	**(পৃষ্ঠা 23 - 56)**	
সাহিত্যের পথে		
বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী		
তৃতীয় একক	**(পৃষ্ঠা 57 - 68)**	
অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস		
চতুর্থ একক	**(পৃষ্ঠা 69 - 80)**	
ক্লাসিজম		

ভূমিকা

টিপ্পনী

বাংলা ভাষার বৈচিত্র্য তার প্রকাশে। আঙ্গিক যাই হোক না কেন, ভাষা বহণ করে ঐতিহ্য। তবে নির্ভুল মুদ্রণের মহাত্য বাড়ায় একথা সকলেই স্বীকার করি। 'সাহিত্যতত্ত্ব : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'বইটির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। আলোচ্য পুস্তকটির প্রথম এককে ''সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র'' সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় এককে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সাহিত্যের পথে' প্রবন্ধটি আলোচিত হয়েছে। সেখানে সাহিত্যের নবত্ব, বাস্তব প্রবন্ধ, তথ্য ও সত্য, আধুনিক কাব্য এবং বাগিশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় এককে অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স এবং চতুর্থ এককে ক্লাসিসিজম্ এর ব্যাক্ষা বইটিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। বইটি অত্যন্ত সহজ - সরল ভাষায় ছাত্র - ছাত্রীদের বোধগম্য করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। স্নাতোকোত্তর ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে 'সাহিত্যতত্ত্ব : প্রাচ্য পাশ্চাত্য' বইটি পাঠ্যসুখকর, সহজবোধ্য এবং প্রয়োজনীয় হবে বলে আশাবাদী।

প্রথম একক

সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র

টিপ্পনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সাহিত্যের পথে' (১৩৪৩) গ্রন্থের ভূমিকায় সৃষ্টি কর্তাকে লীলাময় বলেছেন । মানুষ আপন সৃষ্টির মধ্যে এক অপূর্ব অপার আনন্দ উপভোগ করেন। মানুষ ও আপনার মধ্য থেকে আপনাকে খুঁজে পায় নানান সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। যেই সৃষ্টিকে 'সাজাব যতনে কুসুমে রতনে" । এই সৃষ্টিকে সাজাতে গেলে অবশ্যই তা শব্দে শব্দে বন্ধন দরকার। আবার শব্দের বন্ধনই অবশ্যই অলঙ্কার। মা যেমন শিশুকে নানা অলংকারে সাজায় , বাসর ঘর যেমন নানা ফুলের সমারোহে সাজানো হয়। ঠিক তেমনি ভাবে কাব্য দেহকে নানা অলংকারে সাজান কবিগন।কবির সৃষ্টি কাব্য তথা শব্দ, পদ, বাক্য, শ্লোক প্রভৃতির মধ্যদিয়ে তাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছেন প্রাচীন আলংকারিকেরা।

অলংকার শাস্ত্র বা অলঙ্কার বাদ

যেশাস্ত্রে আলংকারিকেরা কাব্য কে বিশ্লেষন করতে সমর্থ হয়েছেন, সেই শাস্ত্রই হল অলংকার শাস্ত্র। আলংকারিকেরা কাব্যের উপাদান, লক্ষণ, কাব্যাত্মা নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ প্রকাশ করেছেন। আলংকারিকেরা তাদের কাব্য সম্পর্কিত আলোচনা যে গ্রন্থে সন্নিবেশিত, করেছে, সেইগ্রন্থের নাম 'কাব্যজিজ্ঞাসা'।

খ্রীষ্টীয় অষ্টমশতকে আলঙ্কারিক আচার্য বামন তার 'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি" গ্রন্থে - "কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ" বলে অবিহিত করেছেন । অর্থাৎ কাব্য মানুষের উপাদেয় রূপে গ্রাহ্য হওয়ায় মূল কারণ হল অলঙ্কারের সমাবেশ। বামন তার গ্রন্থে দ্বিতীয় সূত্রে বলেছেন - "সৌন্দর্য্যম অলঙ্কার" অর্থাৎ কাব্যের সৌন্দর্যই অলঙ্কার। কাব্যকে শব্দ অলঙ্কার (অর্থাৎঅনুপ্রাস, যমক, বক্রোক্তি, শ্লেষ) ও অর্থালঙ্কার(উপমা, রূপক,উৎপ্রেক্ষ) এ সাজিয়ে দিলে তা সুন্দর হয়ে ওঠে, এবং তা অলংকারের সমাবেশে কাব্যে পরিণত হয়। যদিও পরবর্তীকালে এই 'অলঙ্কারবাদ' গ্রাহ্য হয়নি। কারণ এই মতবাদ 'অতিব্যাপ্তি' এবং 'অব্যাপ্তি' দোষে দুষ্ট।

টিপ্পনী

অতিব্যাপ্তি :

যেখানে অলঙ্কারের প্রয়োগ যথেষ্ট আছে অথচ তা কাব্য হয়ে ওঠেনি সেখানে অতিব্যাপ্তি দোষ।

যেমন - ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় পাই

"এত ভঙ্গ

বঙ্গ দেশ তবু রঙ্গে ভরা"

এখানে একাধিক বার 'ঙ্গ' উচ্চারিত হয়েছে অর্থাৎ অনুপ্রাস অলংকার আছে অথচ চরণটি কাব্য হয়ে ওঠেনি।

অব্যাপ্তি :

যেখানে অলঙ্কার নেই বললেই চলে অথচ কবির বর্ণনা শুনে তা চমৎকারিত লাভ করে। সেখানে ঘটে অব্যাপ্তি দোষ।

অলঙ্কৃত হয়েও শ্রেষ্ঠ কবির বর্ণনা গুনে তা কাব্য হতে পারে। যেমন - বিষ্ণু দে 'ঘোড়সওয়ার' কবিতায় পাই

"আমার কামনা ছায়ামূর্তির বেশে

পায়ে পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে

কাঁপে তনুবায়ু, কামনায় থরো থরো।

কামনার টানে সংহত গ্লেসিয়ার।

হালকা হাওয়ায় হৃদয় আমার ধরো।

হে দূর দেশের বিশ্ব বিজয়ী দীপ্ত ঘোড়সওয়ার।"

এখানে অন্তনিহিত অর্থই প্রাধান্য পেয়েছে। অলঙ্কার নয়। তাই বলা চলে অলঙ্কার বাদ কাব্যের সারকথা বা যর্থাথ পরিচয় নয়।

রীতিবাদ :

কাব্যের আত্মা কি ? এই নিয়ে বিভিন্ন আলংকারিক ভিন্ন চিত্র মত প্রোষন

করেছেন। নাট্যশাস্ত্র বিদ ভরত কাব্যের আত্মারূপে রসকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার বামন বলেছেন - "রীতিরাত্মা কাব্যস্য" অর্থাৎ কাব্যের আত্মা হয়েছে রীতি। এই রীতি হল "বিশিষ্ট পদ রচনারীতি" বামন সৌন্দর্য ও গুন ধর্মকে অতিক্রম করে রীতি বা Style কে কাব্যের আত্মা বলেছেন। আবার বলাচলে কাব্যের আত্মা হল রীতি, রীতির আত্মা হল গুন এবং গুনের আত্মা হল সৌন্দর্য। এই রীতি আবার তিনপ্রকার - বৈদর্ভী রীতি, গৌড়ী রীতি এবং পঞ্চালীরীতি। বিদর্ভ এবং তৎসংলগ্ন এলাকার রীতি হল বৈদর্ভী রীতি। এখানে ওজঃ প্রসাদ গুনের প্রাধান্য লক্ষনীয়। আবার পাঞ্চাল এলাকার রীতি হল পাঞ্চালীরীতি। এখানে মাধুর্য্য ও সৌফুমার্য গুনের প্রাধান্য লক্ষ্যকরা যায়। অর্থাৎ বলা চলে রীতি একটা নিদিষ্ট এলাকা ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। আলংকারিক রুদ্রট লাটীয় নাথ এক প্রকার রীতির কথা বলেছেন । রাজশেখর মৈথিলী রীতির কথা উল্লেখ করেছেন এবং আলংকারিক ভোজদেব অবন্তিকা ও মাগধ নামে আরো দুপ্রকার রীতির উন্মেষ করেছেন। এভাবেএলাকার নামের সাথে সাথুর্য রেখে রীতির সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাওয়ায় আচার্য কুন্ডক এই ধরনের নামকরনকে অস্বীকার করেছেন। অর্থাৎ রীতি হল এক-একটি নিদিষ্ট অঞ্চলের কাব্য লিখন পদ্ধতি -

"শ্লেষপ্রায়মুদীচ্যেষু প্রতীচ্যেষ্বর্থমাক্রম।

উৎপ্রেক্ষা দাক্ষিনাত্যেষু গৌড়েষ্বক্ষরডম্বরম।"

অর্থাৎ অলঙ্কারের প্রয়োগ পাই উদচ্যা রীতিতে , অর্থের গুরুত্ব দেওয়া হয় প্রতীচ্য রীতিতে । দাক্ষিনাত্যরীতিতে উৎপ্রক্ষার প্রয়োগ এবং গৌড়ীরীতিতে দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষনীয়। তবে এই রীতির ফলে স্থানীক বা আঞ্চলিক লিখন ভঙ্গীর পরিচয় মেলে মাত্র। কাব্যের প্রাণবস্তুর পরিচয় পাওয়া দুষ্কর।

অতুল গুপ্ত তাঁর "কাব্যজিজ্ঞাসা" গ্রন্থে সংস্কৃত রীতির সাথে পাশ্চাত্য রীতিতে মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন । তার মতে"অলংকার হচ্ছে এই স্টাইল বা রীতির আনুষাঙ্গিক বস্তু।" রবীন্দ্র নাথের মতানুযায়ী ভাব সর্বসাধারণের কিন্তু তাকে সর্বলোকের উপভোগযোগ্য করে তোলাই রচনাই লেখকের কীর্তি। এখানে রচনা বলতে রীতি বা Style কে বোঝানো হয়েছে। তবে রীতি বা Style বস্তু নয়, অর্থাৎ Style হল কবি বা লেখকের নিজস্ব ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত রচনাশলী। যার মধ্য দীয়ে লেখক চিত্তের ব্যক্তি প্রবণতা ফুটে ওঠে। যেমন রবীন্দ্র স্টাইল, বঙ্কিমী স্টাইল, মধুসূদনীয় স্টাইল, এলিয়াটী স্টাইল ইত্যাদি। আবার রীতি ক্ষেত্রে ব্যক্তি থেকে বড় হয়ে ধরা দেয় আঞ্চলিক লিখন

টিপ্পনী

ভঙ্গীর প্রথানুগত্য। অর্থাৎ Style যেখানে ব্যক্তি সাপেক্ষ, রীতি সেখানে ব্যক্তি নিরপেক্ষ। রীতিতে কবিব্যক্তিত্বের চেয়ে আঞ্চলিকতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তাই রীতি কাব্যের প্রাণ বস্তু হতে পারে না।

টিপ্পনী

(ক) ধ্বনিবাদ এবং অভিধা, লক্ষনাও ব্যঞ্জনা

ধ্বনিবাদ :

ধ্বনিবাদী আলঙ্কারিকদের মতে অলঙ্কার, রীতি, বস্তু বা গুন কাব্যের যথার্থ পরিমাপক বা পরিচায়ক নয়। কাব্যের প্রানবস্তু বা আত্মা হচ্ছে ধ্বনি। ধ্বনিকায় "ধন্যালোক" গ্রন্থে ধ্বনির সংজ্ঞায় বলেছেন-

"যত্রার্থ : শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃত স্বার্থৌ।

ব্যাঙ্‌ক্ত : কাববিশেষঃ স ধ্বনিরীতিঃ সূরভিঃ কথিতঃ।"

যত্রঅর্থ : শব্দ বা (যেখানে অর্থ বা শব্দ) উপসর্জনীকৃত স্বার্থৌ (নিজেদের স্বার্থ বা প্রাধান্য পরিত্যাগ করে) তম্ অর্থম্ (সেই কাঙ্খিত অর্থকে) ব্যপ্রক্তঃ (ব্যাঞ্চিত করে) সঃ ধ্বনি (তাহা ধ্বনি) ইতি কথিতঃ (নামে কথিত হয়) [নন্দনের আলোক রেখা : কাব্য জিজ্ঞাসা; দ. রামজীবন আচার্য; কথা পুস্তকালয়; পৃ- ২০)

অর্থাৎ, যেখানে অর্থ বা শব্দ নিজেদের প্রাধান্য পরিত্যাগ করে প্রতীয়মান অর্থকে ব্যাঞ্জিত করে সেখানে সেই প্রতীয়মান অর্থই হল ধ্বনি।

কাব্যকে ছাড়িয়ে বিষয়বস্তুকে ব্যঞ্জনাদান করতে পারে এমন অতিরিক্ত বস্তুই হল ধ্বনি। সপ্তম শতকের আলঙ্কারিক ভামহ তাঁর "কাব্যালঙ্কার" গ্রন্থে জানিয়েছেন - "শব্দার্থৌ সাহিতৌ কাব্যম।" - অর্থাৎ কাব্যের কায়া গড়ে ওঠে শব্দ ও অর্থের সমবায়ে।

এই শব্দের ত্রিবিধ অর্থ। যথা -

(১) অভিধার্থ বা বাচ্যার্থ বা মুখার্থ

(২) লক্ষনা বা লক্ষ্যার্থ

(৩) ব্যাঞ্জনা বা ব্যঞ্জনার্থ

(১) অভিধার্থ :

বাক্যে শব্দ উচ্চারন করা মাত্রই আমাদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় তার যে প্রাথমিক অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় তাই হল অভিধার্য বা বাচ্যার্থ। কাব্যের মুখ্য অর্থ অভিধানে শব্দের এই অর্থ পাওয়া যায়। যেমন - 'সোনা' শব্দের অভিধানিক অর্থ বা শব্দের অভিধার্থ হল একটি "পীতবর্ণের কঠিন মূল্যবান বস্তু বা ধাতু।" কোন কোন শব্দের আবার একাধিক অভিধানিক অর্থ বা অভিধার্থ বা বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ থাকে। যেমন - 'মৃগ' শব্দের অভিধানিক অর্থ -'হরিণ' : কিন্তু 'রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়ায় গেলেন" - এই বাক্যে 'মৃগয়া' শব্দের অর্থ শুধু হরিণ শিকার নয়, যে কোন ধরনের পশু শিকার। এখানে মৃগের অবিধানিক অর্থ বা অভিধার্থ যে কোন ধরনের পশু। আলঙ্কারিক মহিম ভট্ট এজন্যই বলেছেন শব্দের 'তাৎপর্যবৃত্তই' বলে একটি ব্যাপার আছ, যার দ্বারা বাক্যের মধ্যে শব্দের অবস্থান ও অন্বয় বুঝে বাঞ্জিত অভিধানিক অর্থ বা অভিধার্য পাওয়া যায়।

(২) লক্ষনা :

'অভিধা' রূপ মুখ্যার্থের আর একটি সূক্ষ্ম অর্থ হল 'লক্ষনা'। বাক্যে অভিধানিক অর্থ বা অভিধা শক্তির দ্বারা মুখার্থ বুঝতে অসুবিধা হলে বা বাধা হলে, যে শক্তি দ্বারা বাচ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত প্রকৃত অর্থের বোধ হয় সেটি হল লক্ষনা। স্মৃতির সাহায্যে অভিধা বা বাচ্যার্থের জ্ঞান হয়। আর 'লক্ষ্যার্থ' বা 'লক্ষনা' অর্থের জ্ঞান বা ধারনা অনুমান শক্তির দ্বারা।

লক্ষনা অর্থ মূলত দুধরনের - (ক) রূঢ়ি লক্ষনা ও (খ) প্রয়োজন লক্ষনা।

রূঢ়ি লক্ষনার উদাহরন :

"কলিঙ্গ সাহসিক" এই বাক্যে কলিঙ্গ শব্দের অর্থ 'কলিঙ্গ দেশবাসী'। কলিঙ্গ দেশ অবচেতন বস্তু। এই অবচেতন বস্তু কলিঙ্গ চেতন বস্তু বা চেতন প্রানীর মতো সাহসিক হতে পারে না। লোকের ব্যবহারের জন্যই কলিঙ্গ দেশবাসির স্থলে 'কলিঙ্গ' শব্দের ব্যবহার হয়েছে। এটি রূঢ়ি বা লেক প্রসিদ্ধ। এর দ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয়নি।

প্রয়োজন লক্ষনার উদাহরণ :

(ক) "কুন্তগুলি (বল্লমগুলি) প্রবেশ করল।" এখানে 'কুন্ড' শব্দের অভিধার্য বা অভিধানিক অর্থ বা প্রাথমিক অর্থ হল বাধা পাওয়া এই বাক্যে 'কুন্ডগুলি" শব্দের অর্থ

টিপ্পনী

টিপ্পনী

হল 'কুন্ডধারী সৈন্যগন''। এখানে লক্ষনার প্রয়োজন বিশেষ করে কুন্ডগুলির উদ্যাত ও আক্রমনাত্মক ভাব বোঝানো হয়েছে।

(খ) ''নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস

শান্তির ললিত বানী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস'' -(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

-এখানে 'নাগিনী' শব্দটির বাচ্যার্থ গ্রহন করলে সঠিক অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। 'নাগিনী' শব্দের অর্থে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছেন ফ্যাসিস্ট দানবতার হিংস্র আক্রমনে বিশ্বসতভ্যতা কেমন ভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। সেই দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ'নাগিনী' শব্দের প্রয়োগ কাব্যের গোপন সৌন্দর্য বৃদ্ধির ইচ্ছায় প্রয়োজন মিটিয়েছেন লেখক। লক্ষনা তাই অভিধার থেকে সুক্ষ্মতর অর্থ প্রকাশ করে।

ব্যঞ্জনা:

শব্দে বাচ্যার্থকে বা অভিধা অর্থকে অতিক্রম করে পাঠকের হৃদয়ে গভীর ব্যঞ্জনার সংকেত দ্যোতিত করে অপর একটি নতুন অর্থ প্রকাশ করলে হয় ব্যঞ্জনা। এভাবে ব্যঞ্জনার দ্বারা পাওয়া অর্থকে বলা হয় ব্যঙ্গার্থ বা প্রতিয়মান অর্থ।এই অর্থ পাঠকের হৃদয়ে বহুক্ষন অনুরনন সৃষ্টি করে। তবে এই ব্যাঙ্গার্থ, বাচ্যার্থকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে।

আনন্দবর্ধন 'ধ্বনিলোক' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-

''আলোকার্থী যথা দীপশিখায়াং যত্নবান জনঃ।

তদুপায়তয়া তদবদর্থে বাচ্যে তদাদৃতঃ'' (১/৯)

[প্রসঙ্গঃ অতুলগুপ্তের কাব্য জিজ্ঞাসা, তপন কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রজ্ঞাবিকাশ, পৃ- ৩৬]

অর্থাৎ আলোকার্থী যেমন দীপশিখার প্রতি যত্নবান হন তেমনই বাঙ্গার্থের অনুভবের জন্যপ্রয়োজন হয় বাচ্যার্থ অনুভবের। দীপশিখা শুধু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে চারিপাশকে আলোকিত করা অর্থাৎ যা আলোক প্রয়োজন তাকে আলোকিত করা। এখানে দীপশিখা হন ব্যঞ্জক।তেমনি ভাবে বলা চলে যে, যিনি ব্যাঞ্জনার্থ অনুভব করবেন, তাকে প্রথমেবাচ্যার্থ বা অভিধার্থ অনুভব করতে হবে।। তারপর বাচ্যর্থকে আশ্রয় করেই ব্যাঙ্গার্থের অনুসন্ধান করতে হবে।

কাব্যের এই ব্যঞ্জনা দুই ধরনের হতে পারে -

(ক) শব্দগত ব্যঞ্জনা বা শাব্দী এবং

(খ) অর্থগত ব্যঞ্জনা বা আর্থী

(ক) শব্দগত ব্যঞ্জনা আবার দুই প্রকার :

(১) লক্ষনা মূলাও (২) অভিধা মূলা

(১) লক্ষনমূলা :

যে ব্যঞ্জনার দ্বারা লক্ষনাশক্তির প্রয়োজনের প্রতীতি বা উপলব্ধি হয়, তাকেই লক্ষনামুলা ব্যঞ্জনা বলে।

যেমন - "গঙ্গায়াং ঘোষাঃ" বা "গঙ্গায় ঘোষেরা বাস করে" এই বাক্যে 'গঙ্গা' শব্দের লক্ষনাগত অর্থ হল 'গঙ্গা নদীর তীর'। আবার 'গঙ্গা' শব্দের দ্বারা, গঙ্গা নদীর পবিত্রতা প্রভৃতি সুক্ষ্মতার অর্থ ও পাওয়া যায় লক্ষনামুলা ব্যঞ্জনাশক্তি দ্বারা।

অভিধামলা ব্যঞ্জনাক :

যে ব্যঞ্জনাশক্তির দ্বারা শব্দেরঅভিধানিক অর্থকে আশ্রয় করে অপর একটি সূক্ষ্মতর অর্থ প্রতীত হয় তাকে অভিধা মূলা ব্যঞ্জনা বলে। যেমন - "শূলপানিনা কথিতঃ" অর্থাৎ "শূলপানির দ্বারা কথিত হচ্ছে" - এই বাক্যে শূলপানি শব্দের প্রাথমিক অর্থ - শূলাপানির নামের একজন শাস্ত্রকার আবার শূলপানি শব্দের অপর একটি অর্থ হল ত্রিশূল হস্ত মহাদেব। অর্থাৎ বলা চলে এখানে প্রাথমিক অর্থের অনুরনন ক্রমে যে সূক্ষ্মতার অর্থ পাওয়া গেল তা শুধুমাত্র শূলপানি নামের ব্যক্তি শাস্ত্রকার নয়। তিনি সাক্ষাৎ 'মহাদেব'।

(খ) অর্থগত ব্যঞ্জনা বা আর্থী ব্যঞ্জনা :

যে ব্যঞ্জনা শক্তির দ্বারা ব্যাচার্থকে আশ্রয় করে বক্তা বোদ্ধব্য, প্রকরন প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য হেতু অপর একটি অর্থ প্রতীয়মান হয়, তাই হল অর্থগত ব্যঞ্জনা বা আর্থী ব্যঞ্জনা।

যেমন - "সূর্যঃ অস্তং গতঃ" বা "সূর্য অস্ত গেল"

বাক্যটি দ্বারা বিভিন্ন রকমের অর্থগত ব্যঞ্জনার প্রকাশ ঘটে। এখানে বক্তা ও বোদ্ধব্য যদি গুরু ও শিষ্য হয়, তাহলে অর্থ বুঝতে হবে - 'সন্ধ্যা - বন্দনা' বা পাঠের সময় উপস্থিত আবার বাক্যটিতে বক্তা ও বোদ্ধব্য যদি প্রভু ও ভৃত্য হয় তাহলে বাক্যটির অর্থ

টিপ্পনী

টিপ্পনী

দাঁড়াবে ক্ষেত্রথেকে গো-ধন আনা, অথবা গৃহে সন্ধ্যা প্রদীপজ্বালানো ইত্যাদি। অর্থাৎ বাক্যটিতে শব্দগত কোন দৃষ্টান্ত নেই, বাক্যটিতে একটি অর্থের দ্বারা, অন্য একটি অর্থ উঠে আসছে। তাই বাক্যটিতে অর্থগত ব্যঞ্জনা বা আর্থীব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে।

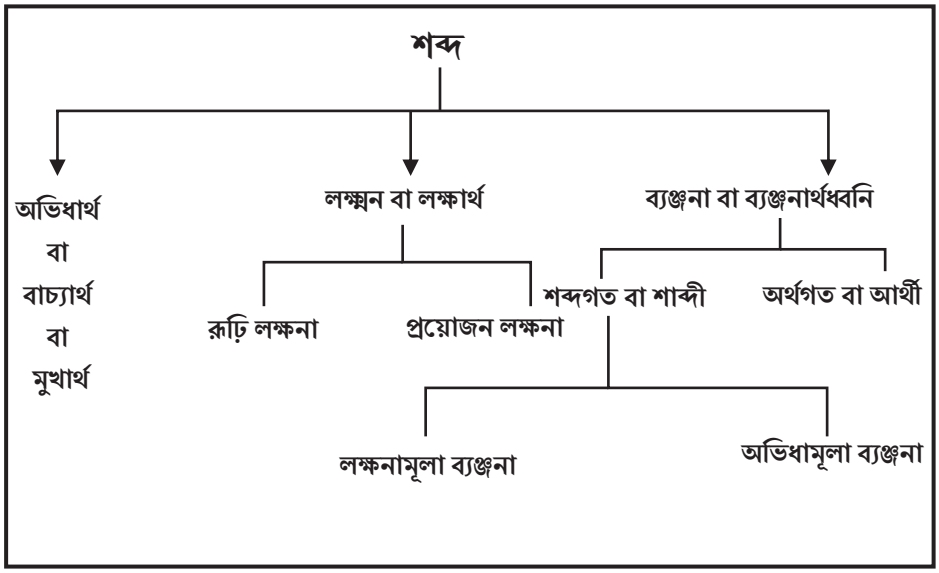

(খ) ধ্বনির শ্রেনিবিভাগ :

প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্র অনুযায়ী ধ্বনির যে প্রকার ভেদ গুলি উপস্থিত হয়েছে তা এভাবে দেখানো যেতে পারে -

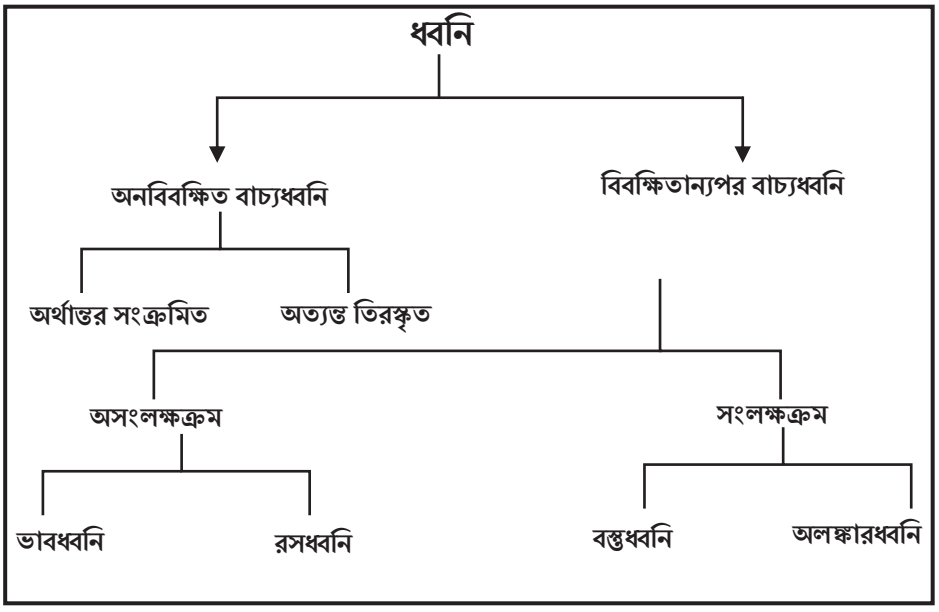

কাব্যের প্রানবস্তু বা আত্মা হচ্ছে ধ্বনি। ধ্বনির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যেখানে অর্থ বা শব্দ নিজের প্রাধান্য পরিত্যাগ করে প্রতীয়মান অর্থকে ব্যাঞ্জিত করে সেখানে হয় ধ্বনি।

আলঙ্কারিকদের মতানুযায়ী ধ্বনি দু-প্রকার

(১) অবিবক্ষিত বাচ্য ধ্বনি

(২) বিবক্ষিতান্যপয় বাচ্য ধ্বনি

(১) অবিবক্ষিত বাচ্য ধ্বনি :

যেখানে বাক্যের বাচ্যার্থ মোটেই কবির বা বক্তার বিবক্ষিত অর্থাৎ উদ্দিষ্ট বা অভিপ্রেত নয় (অবিবক্ষিত) সেখানে হয় অবিবক্ষিত বাচ্যধ্বনি।

অবিবক্ষিত বাচ্য ধ্বনিকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা - (ক) অর্থান্তর সংক্রমিত (খ) অত্যন্ত তিরস্কৃত।

(ক) অর্থান্তর সংক্রমিত :

বাচ্যার্থ যখন নিজের অর্থ বজায় রেখে অন্যঅর্থ দ্যোতিত করে তখন হয় অর্থান্তর সংক্রমিত বাচ্য ধ্বনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাহিনী' কাব্যের অন্তর্গত "গান্ধারির আবেদন" নাট্য কাব্যে দুর্যোধনের উক্তি -

"..... নাহি জানে
জাগিয়াছে দুর্যোধন ; মূঢ় ভাগ্যহীন
ঘনায়ে এসেছে আজি তোদের দুর্দিন।"

- এখানে দুর্যাধন হস্তিনাপুরের প্রজাদের উদ্দেশ্যে এই ক্রোধোক্তি করেছে। এই প্রজারা বনগমনকারী পান্ডবদের দেখার জন্য সজল নয়নে পথের পাশে অপেক্ষা করছে। যা পান্ডব বিদ্বেষী দুর্যোধনের কাছে অসহনীয়। তাই দুর্যোধনের এই সাবধান বানী বা ক্রোধোক্তি। এখানে 'দুর্যোধন' শব্দটি বাচ্যার্থে ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র। কিন্তু অর্থান্তরে ফুটে ওঠে দুর্যোধনের উদ্যাত, হিংস্র, কুটিল মনোভাবাপন্ন স্বরূপটি। এখানে ধ্বনির অর্থ অর্থাৎ বাচ্যার্থ অর্থান্তরে সংক্রামিত হয়ে অন্য অর্থে স্থানান্তরিত হয়েছে। ফলে 'দুর্যোধন' শব্দে কাব্য অর্থটি কবির একমাত্র অভিপ্রেত নয়। ফলে এটি অবিবক্ষিত

টিপ্পনী

টিপ্পনী

বাচ্যধ্বনি।

(খ) অত্যন্ত তিরস্কৃত :

যেখানে বাচ্যার্থটি নিজ অর্থ একে বারে পরিত্যাগ করে অর্থাৎ তিরস্কৃত করে সম্পূর্ন অন্য অর্থ দ্যোতিত করে তখনহয় অত্যন্ত তিরস্কৃত বাচ্য ধ্বনি।

যেমন -

"অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে

চিরদিন ; তোরে লয়ে প্রলয় তিমিরে

চলিয়াছি।" - (রবীন্দ্রনাথ)

- এখানে উক্তিটি করেছেন হস্তিনাপুরের রাজা 'ধৃতরাষ্ট্র'। তিনি অন্ধ অর্থাৎ চোখে দেখতে পান না। সেই অর্থটি 'অন্ধ' শব্দের দ্বারা বলা হয়েছে : কিন্তু যখন তার খেদোক্তি "অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে" তখন 'অন্ধ' কথার দ্বারা ধৃতরাষ্ট্র কে "বিচার বিবেচনাহীন" বোঝাচ্ছে। অর্থাৎ পুত্র স্নেহে তিনি অন্ধ অর্থাৎ বিচার বিবেচনাহীন হয়ে পড়েছেন। তাই এখানে বাচ্যার্থ নিজের অর্থকে অপসারিত করে সম্পূর্ন নতুন অর্থ দ্যোতিত করেছে, ফলে এটি অত্যন্ত তিরস্কৃত বাচ্যধ্বনি হয়ে উঠেছে।

(২) বিবক্ষিতান্যপর বাচ্যধ্বনি :

যেখানে বাচ্যার্থটি বক্তার বিবক্ষিত বা অভিপ্রেত হয়েও অপরবা অন্য একটি অর্থকে প্রধান রূপে বাঞ্জিত করে তখন তাকে বিবক্ষিতান্যপর বাচ্যধ্বনি বলে।

বিবক্ষিতান্যপর বাচ্যধ্বনি দু-প্রকার

(ক) অসংলক্ষক্রম ধ্বনি

(খ) সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনি

এখানে 'ক্রম' শব্দের অর্থ 'সংগতি' রক্ষা। বাচ্যার্থ থেকে ব্যাঙ্গার্থে যাওয়াটা যথাযথ সংগতি পূর্ন হয়েছে কিনা এটা লক্ষ করা।

(ক) অসংলক্ষ্যক্রম ধ্বনি :

বাচ্যার্থ থেকে ব্যাঙ্গার্থ উত্তরন এত দূত ও স্বাভাবিক ভাবে ঘটে যে তার পূর্বাপর

সংগতিক্রম লক্ষ্য করা যায় না, সেখানে হয় অসংলক্ষ্যক্রমধ্বনি।

অসংলক্ষ্যক্রম ধ্বনি কে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা - (আ) ভাবধ্বনি (আ) রসধ্বনি

(অ) ভাবধ্বনি -

যেখানে ব্যাভিচারী ভাব পরিপ্পুষ্ট হয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে সেখানে হয় অসংলগ্নভাব ধ্বনি।

যেমন -

"দেবর্ষি ঘরে কহিলা একথা
পিতার পার্শ্বে পার্বতী নতাননী
হেরিতে লাগল লীলাকমলেয়
দলগুলি গনি গনি।"

-দেবর্ষি হিমালয়ের কাছে কন্যা পার্বতী বিবাহের কথা উত্থাপন করলে পিতার পার্শ্বে উপবিষ্টা পার্বতী মুখ নত করে হাতের লীলাকমল গুনতে থাকেন। এটি বাচ্যার্থ। কিন্তু এখানে ব্যঞ্জনায় পাওয়া যায়। পার্বতির মনের লজ্জানামক ব্যাভিচারী ভাবকে। এই ব্যভিচারী ভাব পূর্বরাগের লজ্জায় ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। দেবাদেব মহাদেবের প্রতি পার্বতীর প্রনয় লজ্জার ব্যাভিচারী - ভাব সৃষ্টি হওয়ার ভাবধ্বনি হয়েছে।

(আ) রসধ্বনি -

যেখানে ব্যাঙ্গার্থ অসংলক্ষ্যক্রম হয়ে বাচ্যর্থকে অতিক্রম করে রসের ব্যঞ্জন সৃষ্টি করে সেখানে হয় অসংলক্ষক্রম রসধ্বনি।

যেমন -

"পঞ্চশরে দগ্ধ করে কচ্ছে একি সন্ন্যাসী
বিশ্বময় দিয়েছে তারে ছড়ায়ে।"

-কবিতা অংশটিতে কাব্যর্থ হল মদনের 'পঞ্চশর'। কিন্তু এখানে বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে মানুষের মনের চিরন্তন বিবাহকে ব্যঞ্চিত করছে। এখানে শৃঙ্গা রস অভিব্যক্তি

টিপ্পনী

হয়েছে। তাই এখানে ধ্বনি হচ্ছে শৃঙ্গার রস ধ্বনি।

(খ) সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনি :

যেখানে বাচ্যার্থ থেকে ব্যাঙ্গার্থ রূপান্তর ক্রিয়াটিতে পুর্বাপর সঙ্গতি লক্ষিত হয় সেখানে সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনি।

টিপ্পনী

যেমন -

"সুদূর গগনে কাহারে সে চায়?
ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায়?
নবমালতীর কচিদল গুলি
আনমনে কাটে দশনে।"

- কবিতাটিতে বাচ্যার্থে নববর্ষার চিত্র ফুটে ওঠে। কিন্তু ব্যঙ্গার্থে এই বর্ষাবর্ণনা বিরহীনী বধুকে স্মরণ করায়। যিনি কলসী নিয়ে ঘাটে জল আনতে গিয়ে আনমনা হয়ে প্রিয়তমের কথা ভেবে ব্যাকুল হয়েছেন। তার জলের পাত্র অর্থাৎ কলসী ঘাট থেকে ভেসে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। ফলে এখানে ব্যাচার্থ থেকে ব্যাঙ্গার্থ উত্তরণ পর্বটি সংগতি ক্রম লক্ষ্য করা যায়। তাই এটি সংলক্ষ্যক্রমধ্বনি।

সংলক্ষ্যক্রমধ্বনি দুই প্রকার - (অ) বস্তুধ্বনি (আ) অলঙ্কার ধ্বনি

(অ) বস্তুধ্বনি -

যেখানে বর্ণনীয় বস্তু থেকে অপর একটি বস্তুর ব্যঞ্জনা ধ্বনিত হয়, সেখানে হয় বস্তুধ্বনি।

যেমন -

"..... নাই কাজ সীতার উদ্ধারি।
বৃথা হে জলধি, আমি বাঁধিনু তোমারে,
অসংখ্য রাক্ষসগ্রাম বধিনু সংগ্রামে।"

-কবিতাংশটিতে এই উক্তির মাধ্যমেরামচন্দ্রের মনের নৈরাশ্য ও হতাশা ফুটে উঠেছে। যা কাব্যাংশের বাচ্যার্থরূপ একটি বস্তু। কিন্তুই এই বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে

অপর একটি বস্তু ধ্বনিসূচিত হচ্ছে। তা হল আমিতবির্য, অপারেজেয় মেঘনাদের বীরত্ব ও পৌরুষত্ব। যার সাথে যুদ্ধে রামচন্দ্রের ভাই লক্ষনের পরাজয় বা মৃত্যুর সম্ভবনা সুচিত করে। তাই এখানে ধ্বনি বস্তুধ্বনি।

(আ) অলঙ্কার ধ্বনি -

যেখানে বর্ণনীয় বস্তু বা অলঙ্কার থেকে অন্য একটি অলঙ্কার ধ্বনিত হয় সেখানে হয় অলঙ্কার ধ্বনি।

যেমন -

"যৌবন বসন্তসম সুখময় বটে

দিনে দিনে উভয়ের পরিনাম ঘটে।

কিন্তু পুনঃ বসন্তের হয় আগমন

ফিরে না ফিরে না আর ফিরে যৌবন।"

- এখানে বাচ্যার্থে যৌবন ও বসন্তের কথা বলা হয়েছে। বসন্ত বার বার ফিরে আসে কিন্তু যৌবন আর ফিরে আসে না। ফলে এখানে ব্যাতিরেক অলঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। এখানে যৌবনের উৎকর্ষতা হেতু উৎকর্ষতাজনিত যে ব্যাতিরেক অলঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে তা অধিক পরিমানে চমৎকারিত্ব দান করে।

রসবাদ

রস কথাটি বলতে সংক্ষেপে বোঝায় - "রস্যতে স্বাদতে ইতি রস" - অর্থাৎযা আস্বাদিত হয় তাই যথার্থ রস। প্রাচিন আলঙ্কারিকগন মনে করেন, যা কাব্যের যথার্থ সৌন্দর্য সম্পাদন করে তাই হল 'রস'। আবারআলঙ্কারিকগন রস ধ্বনিকেই সর্বশ্রেষ্ট ধ্বনি বলেঅভিহিত করেছেন। রস হল কাব্যের আস্বাস্ছনীয় ফল।

ভারতীয় কাব্যতত্বের প্রাচীনতম কাব্যনাট্য শাস্ত্রে আচার্য ভরত নাট্য রসের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ।সেই সাথে বিভাব, অনুভাব ও ব্যাভিচারী বা সঞ্চারী ভাবের সহায়তায় সেই রসের নিষ্পত্তি ও ঘটিয়েছিলেন। আচার্য ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে রসের স্বরূপ জানাতে বললেন -

টিপ্পনী

টিপ্পনী

"নহি রসাদ ঋতে কশ্চিদার্থঃ প্রবর্ততে।

তত্র বিভাবানুভাব - ব্যাভিচারি- সংযোগঃ রসনিষ্পত্তিঃ।"

-অর্থাৎ বলাচলে - "রসছাড়া কোনো বিষয়ই প্রবর্তিত হয় না। সেই নাট্য বিষয়ে বিভাব, অনুভাব ও ব্যাভিচারি ভাবের সংযোগে রসনিষ্পত্তি হয়ে থাকে।"

ভরতের এই মত বহুদিন স্বীকৃতি লাভ করলেও তার সূত্রের 'সংযোগ' ও 'নিষ্পত্তি' শব্দ দুটি নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধে।

ভরত তার রসশাস্ত্র গ্রন্থে আটটি স্থায়ী ভাব থেকে আটটি রসেরউৎপত্তি হয় বলে উল্লেখ করেন। আটটি স্থায়ী ভাব হল -

"রতিহাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ।"

- অর্থাৎ রতি হাস, শোক,ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্স এবং বিস্ময়। - এই আটটি স্থায়ী ভাব মানুষের মধ্যে সর্বদা থাকে। যা পূর্বজন্মের সংস্কার বলে ধরা হয়ে থাকে।

"শৃঙ্গার- হাস্য - করুন - রৌদ্র - বীর - ভয়ানকার।

বিভৎসাদ্ভুত - সংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যো রসা স্মৃতাঃ।।"

- অর্থাৎ, শৃঙ্গার, হাস্য, করুন, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত এই আটটি রস উৎপন্ন হয়। যা নাট্যরস নামে খ্যাত। এছাড়া 'শাম' নামক স্থায়ী ভাব থেকে 'শান্তরস' সৃষ্টি হয়।

স্থায়ীভাব

মানুষের হৃদয়ে অসংখ্যভাব আছে। যার দ্বারা মানুষের হৃদয় কখনো প্রেম ভাবে পূর্ন হয়েওঠে আবার কখনো বা হাসিতে উদ্বেল হয়, কখনো বা শোকে কাতর হয়ে পড়ে, কখনো ক্রোধে উন্মত্ত হয়। এই ভাবে মানুষের হৃদয়ে কখনো ভয়, ঘৃনা, বিস্ময় বা প্রসন্বতা জাগে। হৃদয় সাগরের এই ভাব যেন সংখ্যাহীন তরঙ্গ। এই অসংখ্য ভয়ের মধ্যে কতগুলি ভাব চিরন্তন। তারা অক্ষব অব্যয়। এই ভাবগুলি বিনষ্ট যেমন হয় না। তেমনি এদের উদয় ও ঘটে না। প্রত্যেকটি মানুষের হৃদয়ে চিরন্তন সংস্কাররূপে এগুলি

বিরাজিত। রসশাস্ত্র পন্ডিতেরা এই উদয় বিলয়হীন শাশ্বত ভাবগুলিকেই স্থায়ীভাব বলে অভিহিত করেছেন। আচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতানুযায়ী - "অবিরুদ্ধ বা বিরুদ্ধ অন্যকোন ভাব থাকে আচ্ছাদন করতে পারে না। যা রসাস্বাদ অঙ্কুরের মূল, তাই স্থায়ীভাব।"

টিপ্পনী

অভিনব গুপ্তের মতে - "স্ব চ রসো রসীকরন যোগ্য।"

-অর্থাৎ বলা চলে "স্থায়ীভাবই" অন্য ভাবগুলির সম্রাট।

স্থায়ী ভাবের মোট সংখ্যা নয়টি-

যথা : - রতি (মনের অনুকূল প্রেমাসিক্ত ভাব); হাস (বিকৃত ভাবের জন্য মনের স্ফুরন); শোক (প্রিয়নাশ হেতু মনের বিফলতা); ক্রোধ (প্রতিকূলবিষয়ের উগ্রভাব); উৎসাহ (কর্তব্য সম্পাদনের উদ্যাম); ভয় (ভীতির ভাব); জুগুপ্সা (ঘৃনার ভাব) ; বিস্ময় (অলৌকিক বিষয়ে চিত্তের বিস্তারিত ভাব) এবং শাম (বিষয় বিমুখতার জন্য আত্মার মনের বিশ্রাম জনিত সুখ)।

এক একটি স্থায়ীভাব, এক একটি রসে পরিণত হয়। যেমন রতিভাব > শৃঙ্খায় রস ; হাসভভাব > হাসভরস ; শোকভাব > করুন রস : ক্রোধ ভাব > রৌদ্ররস ; উৎসাহ ভাব > বীররস ; ভয়ভাব > ভয়ানক রস ; জুগুপ্সা ভাব > বীভৎসরস ; বিস্ময় ভাব > অদ্ভুত রস এবং শমভাব > শান্তরস প্রভৃতি।

বিভাব, অনুভাব ও ব্যাভচারীভাব বা সঞ্চারীভাব

বিভাব :

বাইরের জগতের কোন না কোন কারনের জন্য আমাদের হৃদয়ে ভাব জাগে। লৌকিক জগতে যা রতি, হাসি, শোক পরভৃতি উদ্বোধনের কারন কাব্য বা নাট্য জগতে তা নিবেশিত হলে তার নাম হয় বিভাব।

অন্যভাবে বলা যায় বিচিত্র কারনে মনের যে বাসনাগুলো (ভাব) জেগে ওঠে। বিচিত্র কারনে তার আত্মপ্রকাশ ঘটে। মনের এই বাসনা গুলোকে 'ভাব' বলা হয়। তেমনি ভাব জাগরনের কারনকে বলা হয় বিভাব।

সাহিত্য দর্পন কার বিশ্বনাথ কবিরাজ তার 'সাহিত্য দর্পন' গ্রন্থে বলেছেন -

টিপ্পনী

"রত্যদভুদ্‌বোধকারঃ লোকেবিভাবাঃ কাব্য নাট্যয়েঃ।"

- অর্থাৎ লৌকিক জগতের 'কারন' কাব্য বা নাট্য জগতের 'বিভাব'। অভিনব গুপ্তের মতে "অলোকিক এবং বিভাবটি ব্যবহার" অর্থাৎ তার মতে লৌকিক জ্ঞানের উপায় হল 'কারণ' এবং বিশিষ্ট জ্ঞানের উপায়কে বলে বিভাব।

বিভাব দু-প্রকার - (ক) আলম্বন বিভাব (খ) উদ্দীপন বিভাব

(ক) আলম্বন বিভাব :

যে বিষয়কে অবলম্বন করে মনে রসের ভাব জাগে তাকে আলম্বন বিভাব বলে। যেমন : কালিদাসের 'অভিজ্ঞানম্ শকুন্তলম্' নাটকে নায়ক নায়িকা দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা হল 'রতি' ভাবের "আলম্বন বিভাব"।

(খ) উদ্দীপন বিভাব :

যে অনুকূল পরিবেশে মনেভাব জাগ্রত হয় বা রস বস্তুকে উদ্দীপিত করে তাই "উদ্দীপন বিভাব"

যেমন - "এ সখি হামারি দুখের নাই ওর

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর

শূন্য মন্দির মোর।" (বিদ্যাপতি)

- এখানে 'ভরা বাদর' (ভরা বর্ষাকাল) ও 'মাহ ভাদর' (ভাদ্রমাস) রাধার মনে বিরহ রাতি ভাবকে উদ্দীপিত করে। তাই এক 'উদ্দীপন বিভাব'।

অনুভাব :

মনে বা হৃদয়ে কোন ভাব উদয় হলে, যে স্বাভাবিক কারন বা বিচার বা উপায়ে তা বাইরে প্রকাশিত হয় তাই অনুভাব। হৃদয়ে শোক উপস্থিত হলে চোখে জল দেখা দেয়, ক্রোধ ভাব জাগ্রত হলে শরীর কাঁপে, আনন্দে উচ্ছাস প্রকাশ করি। এই যে ভাবের বা বিকারের বহিঃপ্রকাশ তা কাব্যে নিবেশিত হলে হয় 'অনুভাব'। 'বিভাব' হল ভাব উদ্‌গমের 'কারণ' আর অনুভব হল; সেই কারনের 'কার্য' বা 'ক্রিয়া'।

বিশ্বনাথ কবিরায় তার সাহিত্য দর্পন গ্রন্থে বলেছেন -

"উদবুদ্ধং কারনৈ স্বেঃ স্বৈর্

বহির্ভাবং প্রকাশয়ন্।

লোকে যঃ কার্য রূপঃ

সোহনুভাবঃ কাব্যনাট্যয়োঃ।"

-অর্থাৎ "মনে ভাব উদ্বুদ্ধ হলে যে সব স্বাভাবিক বিকার বা উপায়ে তা বাইরে প্রকাশ পায়, ভাব রূপ কারনের সেই সব লোকিক কার্য, কাব্য ও নাটকের অনুভাব।" ভাবের উদ্বোধনের অনু বা পরে যাদের উৎপত্তি তাই অনুভাব।

ব্যাভিচারী ভাব বা সঞ্চারীভাব :

স্থায়ী ভাবের অভিমুখে যে ভাব বিচরণ করে তাই হল ব্যভিচারী ভাব বা সঞ্চারী ভাব। মানুষের হৃদয়ে নয়টি স্থায়ী ভাব আছে, সেই স্থায়ী ভাব ছাড়া আরো তেত্রিশটি সহায়ক ভাব আছে যা এই স্থায়ী ভাবকে পুষ্টি বা পোষকতা দান করে। অর্থাৎ স্থায়ী ভাবের দিকে এরা সঞ্চরণ বাঅভিগমন করে। সেই কারনে এদের সঞ্চারী বা ব্যাভিচারী ভাব বেল।

যেমন-

রাস্তায় বাঘ দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে 'ভয়' নামক স্থায়ী ভাব জাগে। এই স্থায়ী ভাবেরসঙ্গে সঙ্গে জড়তা, মরণ, চিন্তা প্রভৃতি ব্যাভিচারী বা সঞ্চারী ভাব ক্রিয়া করতে থাকে ফলে দেহ যন্ত্রের ক্রিয়ার পরিবর্তন শুরু হয়। তখন আমরা থর থর করে কাঁপতে শুরু করি , কণ্ঠ শুকিয়ে যায়, তারপর ছুটে পালাই। এখানে স্থায়ী ভাব হল 'ভয়'। সঞ্চারী বা ব্যাভিচারী ভাব। দেহের নানান পরিবর্তন।

মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাথ বধ' কাব্যে স্থায়ী ভাব হল 'শোক'। এর ফলে বীর বা করুন রসের পোষকতা হল সঞ্চারী বা ব্যাভিচারী ভাব।

এজন্য 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থে লা হয়েছে-

"রসো রসান্ত রস্য ব্যাভিচারী ভবতি।" (৩/২৪) অর্থাৎ একটি রস অন্য রসের ব্যাভিচারী হতে পারে।

বক্রোক্তিবাদ :

টিপ্পনী

টিপ্পনী

প্রাচীন অলঙ্কার শাস্ত্রে তথা সাহিত্য তত্ত্বে বক্রোক্তিবাদ একটি গুরুত্বপূর্ন মতবাদ। সংস্কৃত এবং বাংলা অলঙ্কার শাস্ত্রে বক্রোক্তিকে আমরা শব্দালঙ্কার হিসাবে জানি। কোন কথার যে অর্থটি বক্তার অভিপ্রেত, সেই অর্থটি না ধরে শ্রোতা যদি তার অন্য অর্থ গ্রহণ করেন তাহলে হয় বক্রোক্তি অলঙ্কার। বক্রোক্তিকে শব্দালঙ্কারের এই সংকীর্ন গন্ডি থেকে সরিয়ে এনে ব্যাপক অর্থে কাব্য বিজয়ের দার বিশাল রাজ্যে নিয়ে এলে আলঙ্কারিক অস্পষ্ট কুন্ডক। কুন্ডক তাঁর "বক্রোক্তিজীবতিম" গ্রন্থে এই বক্রোক্তির তত্ত্ব কে পূর্নতা দিয়েছেন। বক্রোক্তি হল 'কাব্যের জীবিত বা প্রাণ'।

আলঙ্কারিক কুন্ডকের পূর্বে আচার্য ভামহ বক্রোক্তি সম্পর্কে মূল্যবান কিছু তথ্য দিয়েছেন,, সেগুলি আগে জানা প্রয়োজন।

ভামহের বক্রোক্তি বাদ :

ষষ্ঠ শতাব্দীর আলঙ্কারিক দন্ডীর মতে কাব্য দু-ভাগে বিভক্ত - স্বভাবোক্তি এবং বক্রোক্তি। স্বভাব বা বস্তুর যথাযথ রূপের বর্ণনা হল স্বভাবোক্তি। আর বস্তুর অলঙ্কার ময় বর্ণনা হল বক্রোক্তি। ভামহ স্বভাবোক্তিকে, কাব্য এবং অলঙ্কারের ক্ষেত্র থেকে বাদ দিতে চেয়েছেন। আবার ভামহ বক্রোক্তিকে শব্দালঙ্কার থেকে বের করে এনে অর্থালঙ্কারের অন্তর্গত অতি শয়োক্তি অলঙ্কারের সাথে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন। ভামহের মতে - সূর্য অস্থ গেছে, চাঁদ উঠেছে, পাখিরা বাসায় ফিরছে, এ সবই বর্ণনা মাত্র। কাব্যধর্মী নয় তবে মতে উপমায় চূড়ান্ত পরিনতি হল অতিশায়েক্তি : যেখানে উপমেয়কে সম্পূর্নভাবে গ্রাস করে উপমান উপমেয়ের স্থান অধিকার করে ফলে কাব্য চমৎকারিত্ব লাভ করে।

সাধারণ অর্থে বক্রোক্তি হল বাঁকা উক্তি। বক্র শব্দের অর্থ বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন - কানে শুনে শব্দার্থের যা বোঝা যায় তার থেকে আরো কিছু বোঝানোই হল বক্রতা। ভামহের মতে বক্রোক্তি সেই আরো কিছুর জানান দেয়। তাই তারমতে সব অলঙ্কারই বক্রোক্তি। বক্রোক্তি ছাড়া অর্থালঙ্কার হয় না। অর্থাৎ তিনি বক্রোক্তির মধ্যেই সমস্ত অর্থালঙ্কারকে বুঝতে চেয়েছেন।

কুন্ডকের বক্রোক্তিবাদ :

খ্রীষ্টিয় দশম শতকের আলঙ্কারিক হলেন কুন্ডক। তিনি বক্রোক্তিকে 'অতিশয়োক্তি' বলে মনে করেননি। কুন্ডক অলঙ্কার, ধ্বনি ও রসের কোন পৃথক

অস্তিত্বে কথা স্বীকার করেন নি। কুন্ডকের মতে "শব্দ ও অর্থের মিলনে যে সাহিত্য তার 'শব্দ' ও 'অর্থ' দুই-ই অলঙ্কৃত হওয়ার যোগ্য। তাই তারা অলঙ্কার্থ। আর বক্রোক্তি হল তাদের অলঙ্কার।

এই বক্রোক্তির অর্থ হল - "বৈদগ্ধ্য ভঙ্গী ভনিতি" যার সহজ অর্থ - "রসিকোচিত ভঙ্গিতে উক্তিবৈচিত্র্য"। এভাবে কুন্ডক বক্রোক্তি শব্দটির নতুন অর্থ দিলেন ও প্রচলিত অলঙ্কারের ক্ষেত্রেই শুধু সে অর্থ সীমিত রাখলেন না, তা কার্য বিচারের অন্যান্য সূত্র বক্রেক্তির অন্তর্গত হল।

তিনি আরো বলেন - মিলিত শব্দার্থ কাব্য রসিকদের আহ্লাদজনক বক্রতাময় কবি ব্যাপার পূর্ন রচনাবন্ধে বিন্যস্ত হলেই কাব্য হয়ে থাকে। রসিক জনের "অদ্ভুতামোক্ষ চমৎকার" বিধানের জন্য কাব্য সাহিত্য রচিত হয়, সাহিত্যের মধ্যে শব্দ ও অর্থের অবস্থান হবে 'সাম্য-সুভা'। কাব্যের অন্তর্গত শব্দকে বাক এবং অর্থকে বাচ্য বলা যেতে পারে। তারা পরস্পরকে অবলম্বন করে রমনীয় হয়ে ওঠে।

'অর্থ' সম্বন্ধে কুন্তকেয় বক্তব্য আরো গভীর ও বিশদ। তিনি বলতে চেয়েছেন যে কোন প্রতিভাবান কবি যখন পরিচিত বা বাস্তব জগতের কোন বস্তুকে অবলম্বন করে কার্য রচনা করেন তখন তার অন্তরে ভাব লোকে একটি অলোড়ন জেগে ওঠে। বাইরের জগতের বস্তু অন্তরের আলোড়ন জাত কবির অনুভবে ভাবময় হয়ে ওঠে। তখন কবি এমন সব নতুন শব্দ নির্বাচন করেন যা ভাবম বস্তুর সাথে সঙ্গতি পূর্ন। এইভাবে শব্দার্থের মধ্যে কবির আলোড়িত ভাব যা ধরা দেয় তা আর লৌকিক জগতের থাকেনা। অদ্বিতীয় শব্দ ও অর্থের এক অতুলনীয় মিলন ঘটে। শব্দ ও অর্থের এই বিশেষ ধরনের মিলন - যা কোনো কাব্যকলায় শৈল্পিকধর্ম রূপে দেখা দেয় একেই প্রসারিত অর্থে কুন্ডক বলেছেন বক্রতা।

দন্ডীর 'স্বভাবোক্তি' ধরনাকে কুন্ডকে যথাযথ যুক্তি দিয়ে খন্ডন করেছেন। তিনি অনুপ্রাস প্রভৃতি শব্দালঙ্কার ও উপমা প্রভৃতি অর্থালঙ্কারকে অস্বীকার করেনি। তবে তার মতে এ সবের উপস্থিতি মাত্রেই রচনা কাব্যত্ব লাভ করে না। বক্রতার সঙ্গে শান্তরস যোগে প্রচলিত অলঙ্কার কাব্যে যর্থার্থ স্থানটি লাভ করে তা বক্রোক্তিরই একটি স্তর হয়ে ওঠে। কবি কল্পনাই যার জনক। তাই কুন্ডকের আলোচনা থেকে উঠে আসে অলঙ্কারে দুটি বৈশিষ্ট 'বক্রতা' ও 'কবিব্যাপার'। যা ধ্বনি পরবর্তী আলঙ্কারিকদের অনেকেই প্রভাবিত করেছে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

কুন্তক বক্রোক্তিকে ছয়টি ভাগে ভাগ করেছেন -

(১) বর্ণবিন্যাস বক্রতা

(২) পদপূর্বার্ধ বক্রতা

(৩) প্রত্যয় বক্রতা

(৪) বাক্য বক্রতা

(৫) প্রকরন বক্রতা

(৬) প্রবন্ধ বক্রতা

এদের মধ্যে 'বাক্য বক্রতাতেই' সৌন্দর্য বেশী। একে 'বাচক বক্রতা' ও বলা হয়ে থাকে।

উদাহরন -

"আসল কথাটা আমি যা বুঝি
প্রেম - ফ্রেম বাদে, আসলে আমরা নতুন খুঁজি
নারীকে পুরুষ, পুরুষকে নারি তাই তো খোঁজে।"

(বিষ্ণু দে। মন দেওয়া নেওয়া : চোরাবালি।।)

আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. ধ্বনিবাদ পুর্ববর্তী অলঙ্কার বাদ ও নীতিবাদ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২. ধ্বনিবাদ প্রসঙ্গে অভিধা, লক্ষনা ও ব্যঞ্জনার পরিচয় দাও।

৩. ধ্বনি কাকে বলে ল উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়ে দাও।

৪. ধ্বনির শ্রেনী বিভাগ করে চিত্রের সাআয্যে বুঝিয়ে দাও।

৫. ভাব ধ্বনি ও রসধ্বনির পার্থক্য বুঝিয়ে দাও।

৬. আচার্য ভরতের রস সুদ্র অবলম্বনে রসবাদের পরিচয় দাও।

৭. বভাব, অনুভাব ও ব্যাভিচারী ভাব বা সঞ্চারী ভাবের পরিচয় দাও।

৮. বক্রোক্তি বাদ কাকে বলে? সংক্ষেপে লেখ।

৯. কুন্তকের বক্রোক্তি বাদের পরিচয় উদাহরণ সহ উল্লেখ করো।

১০. বক্রোক্তিবাদের আলোচনায় কুন্তকে কেন শ্রেষ্ঠ বলা হয় তা উল্লেখ করো।

ঋন স্বীকার

টিপ্পনী

১. কাব্য জিজ্ঞাসা : অতুল গুপ্ত

২. প্রসাদ : অতুল গুপ্তের কাব্য জিজ্ঞাসা : তপনকুমার চট্টোপাধ্যায় ; প্রজ্ঞাবিকাশ। কোলকাতা-৯

৩. নন্দনের আলোরেখা : কাব্য জিজ্ঞাসা : ড. রামজীবন আচার্য ; বামা পুস্তকালয়, কলিকাতা-৯

৪. রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ডাইরেক্টরেট অফ ডিসট্যান্স এডুকেশন, কলা - ষষ্ঠ পত্র, রবীন্দ্র ভবন, ই ই-৯ ও ১০ সেক্টর-২ কোলকাতা-৯১

টিপ্পনী

দ্বিতীয় একক

সাহিত্যের পথে

ভূমিকা

টিপ্পনী

শিল্প - সাহিত্য সাধনা রবীন্দ্রনাথের আজন্ম লালিত। তিনি শিল্প - সাহিত্যের নন্দন তত্ত্ব নিয়ে গুরু গম্ভীর ব্যাখ্যা 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে করেছেন। এই প্রবন্ধ গ্রন্থে গুরুত্বপূর্ন বিষয় নিয়ে নন্দন তত্ত্বে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন - যেমন - বাস্তব, সাহিত্য, তথ্য ও সত্য,সৃষ্টি, সাহিত্যধর্ম, সাহিত্বে নবত্ব, সাহিত্য বিচার, আধুনিক কাব্য, সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্য সমালোচনা , রূপশিল্প প্রভৃতি নানা বিষয়। শিল্প ও সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ 'অপ্রয়োজনের আনন্দ' , 'প্রকাশই কবিত্ব' প্রভৃতি বলে বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 'কলাকৈবল্য বাদী' (Art for art's sake) এই মতবাদে বিশ্বাসী। কলাকৈবল্যবাদী হলেও রূপ-রস ও বিষয় তিনটিকে প্রাধান্য দিতেন। রবীন্দ্রনাথের নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নিজস্ব বক্তব্য 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের প্রবন্ধ মালায় ব্যক্ত।

'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি শ্রী অমিয় চক্রবর্তীকে সাহিত্যতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক বিশাল জ্ঞান ভান্ডারের সন্ধান ছিলেন। জ্ঞানী প্রজ্ঞানন ত্রিকালজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আনন্দবাদ, লীলাতত্ত্ব সৌন্দর্যতত্ত্বের কথা জানালেন এইগ্রন্থের ভূমিকায়। 'বাস্তব' প্রবন্ধে আছে বহুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়কে রসবস্তুতে পরিনত করে উৎকৃষ্ট শিল্প ও সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে। 'তথ্য ও সত্য' তে তথ্যের অন্তর্নিহিত রূপই সত্য তা প্রকাশ করতে গিয়ে চিরন্তনতার প্রসঙ্গ এনেছেন। অন্তরের সৌরভ এবং শিল্প রসসম্পন্ন হৃদয়ের মধ্য দিয়ে সত্যের প্রকাশ তা সত্য সুন্দর মঙ্গলের সম্মিলনের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন । 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে আধুনিকতার স্বরূপ , সংজ্ঞা, নিরূপন করেছেন।'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধে সাহিত্যের বিষয় আদর্শ নিয়ে কথা যেমন আছে তেমনি রস দৃষ্টিতে বিষয়কে আস্বাদনের কথা উল্লেখ করেছেন।

ভূমিকা অংশের আলোচনা

সাহিত্যের পথে প্রবন্ধ গ্রন্থটি ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি উৎসর্গ

টিপ্পনী

করেছেন কল্যানীয় শ্রীমান অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে। কিন্তু গ্রন্থের ভূমিকা রচনা এক নবরূপ দেখলাম। শ্রীমান অমিয় চক্রবর্তীকে যেন পত্র লিখছেন কবিগুরু। সাহিত্য যে আনন্দকর, সৌন্দর্য রচনা করাই সাহিত্যের এটিতে তাঁর খটকা আছে, তারসঙ্গে রসনিষ্পত্তিই প্রসঙ্গ এনেছেন। অর্থাৎ সৃষ্টি হল লীলাময় সত্তার প্রকাশ -

"সেই বৃহৎবিচিত্র লীলাজগতের সৃষ্টি সাহিত্য।"

এই গ্রন্থের ভুমিকায় তিনি যেন পত্র লেখকের মতো বলেছেন - "এই প্রসঙ্গে একটি কথা বার বার নানা রকম করে বলছি। সেটা এই বইয়ের ভূমিকায় জানিয়ে রাখি।" এই জানিয়ে রাখতে গিয়েই সাহিত্য ও সৌন্দর্যতত্ত্বের অবতারনা করে বসলেন, আমরা যে জগত কে মনন দিয়ে জানছি সেই জানাকে তিনি দুই জাতে বলেছেন। তাঁর পরই বললেন -

"জ্ঞানে জানি বিষয়কে। এই জানায় জ্ঞাতা থাকে পিছনে, আর জ্ঞেয় থাকে তার লক্ষ্যরূপে সামনে।"

আর ভাবে আপনাকে জানি যার বিষয়টা থাকে উপলক্ষ্য রূপে, বিজ্ঞান সাধনা যে নিরাসক্ত তা কয়েকটি বাক্যে বুঝিয়ে দিলেন -

"বিশ্বকে জানার কাজে আছে বিজ্ঞান। এই জানার থেকে নিজের ব্যক্তিত্বকে সরিয়ে রাখার সাধনাই বিজ্ঞানের।"

অন্যদিকে মানুষ তার নিজেকে দেখার উপলব্ধি করার জন্য আছে সাহিত্য। মানুষের মনে সুন্দরের অসুন্দরের লীলা কিভাবে চলছে তা বলতে গিয়ে জানালেন -

"মন চায় মিলতে, মিলে হয় খুশি। মানুষের আপনাকে নিয়ে এই বৈচিত্রের লীলা সাহিত্যের কাজ। সে লীলায় সুন্দর ও আছে, অসুন্দর ও আছে।"

সাহিত্য যে সুন্দর কে নিয়ে কারবার করে তা তিনি মেনেছেন। আনন্দদায়ক বিষয়কে মন সুন্দর বলে -

" আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী।" দুঃখের সাহিত্য ও আনন্দ দায়ক হয়ে ওঠে। সে সম্বন্ধে কবিগুরুর উক্তি -

"দুঃখের তিব্র উপলব্ধি ও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতা সূচক; কেবল অনিষ্টের আশঙ্কা না থাকলে দুঃখকে বলতুম সুন্দর। দুঃখ আমাদের স্পষ্ট

করে তোলে, আপনার কাছে আপনাকে ঝাপসা থাকতে দেয় না। গভীর দুৎখ ভূমা ; ট্র্যাজেডির মধ্যে সেই ভুমা আছে, সেই ভুমৈব সুখম্।"

সত্য সুন্দর কে আমরা জীবন দিয়ে উপলব্ধি করি তাই তার মধ্যে এত আনন্দধারা কীটসের বাণীতে -

"Truth is beauty, beauty truth' স্বয়ং কবিও এই উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। সাহিত্যে রস আস্বাদ করতে গেলে প্রয়োজন একান্ত উপলব্ধি। এভাবেই কবিগুরু ভূমিকার মধ্যে সাহিত্য তত্ত্ব ও তার লীলাময় আনন্দবাদের কথা ফুটিয়ে তুলেছেন।

সাহিত্যে নবত্ব

সাহিত্যে নবত্ব প্রবন্ধে সাহিত্য সর্বজনীনতার কথা এনেছেন এই সর্বজনীন সাহিত্যের গুন হল 'অপূর্বতা, 'ওরিজিন্যালিটি'। মহৎ সাহিত্য দেশ - কাল- পত্র ভেদে সব সময় গ্রহণ যোগ্য আদরনীয়, সে যে ভাষার হোক না কেন রসিক মানুষ তা পাঠ করে আনন্দ উপভোগ করতে পারে। প্রসঙ্গ ক্রমে রবীন্দ্রনাথ হোমারের মহাকাব্যের গ্রীক কাহিনীর কথা বলেছেন। এই রস স্বাদনের ব্যাপারে আপেলের উদাহরন -

"আপেল ফল আমাদের দেশের অনেক লোকের পক্ষেই অপরিচিত, ওটা সর্বাংশেই বিদেশী, কিন্তু ওর মধ্যে যে ফলত্ব আছে সেটাকে আমাদের অত্যন্ত স্বাদেশিক রসনা ও মুহূর্তের মধ্যে সাদরে স্বীকার করে নিতে বাধা পায় না।"

বিজাতীয় সাহিত্য হলেও প্রকৃত রসসৃষ্টিকে মূল্যদিতে হবে। নতুন বিষয়কে আস্বাদন করতে হবে। তবেই তো সাহিত্যের মর্যাদা সম্ভব।

'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধে সাহিত্যের বিষয় ও আদর্শ নিয়ে তিনি মন্তব্য করলেন -

"বাংলাদেশে প্রথম ইংরেজি শিক্ষার যোগে এমন সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের চেনা শোনা হল যার স্থান বিপুল দেশের ও নিরবধি কালের। সে সাহিত্যের বলবার বিষয়টা যতই বিদেশী হোকনা, তার বলবার আদর্শটা সর্বকালীন ও সর্বজনীন।"

আমাদের দেশে শোনবার কান তৈরি হয়েছে। এই কান তৈরি হলে শক্তিশালী লেখকের উদ্ভব ঘটবে। সাহিত্যের বড় মহাজনরা সমগ্র নিয়েই কাজ করেএটি প্রাবন্ধিককে বক্তব্য। ইংরেজি সাহিত্য আমাদের কাছে ব্রাত্য নয়। আমাদের দেশে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

নবজাগরনের কালে পাশ্চাত্য প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারি না। শিক্ষা সাহিত্যেও "ইংরেজি শিক্ষার গোড়াতেই আমরা যে সাহিত্যের পরিচয় পেয়েছি তার মধ্যে বিশ্ব সাহিত্যের আদর্শ ছিল এ কথা মানতেই হবে।"

বড় মহৎ কে তিনি সম্মান দিয়েছেন, তবে এই আদর্শ যে ইউরোপে সকল সময় একই রকম উজ্জ্বল ছিল তা মানতে পারেননি। সাহিত্যের সময় একটানা চলতে পারে না, কখনো কখনো তা ক্ষীন হয়ে আসে।

রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে লেছেন "আমাদের দেশের নবীন লেখকদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় পাকা হবার মতো যথেষ্ট সময় পাই নি, একথা আমাদের মানতেই হবে।" রবীন্দ্র সমকাল বাংলাদেশে নব অভুদয়ের যুগ। এই সময় সাহসিক কবি সাহিত্যিকদের আগমন ঘটেছে। এই সকল সাহিত্যিকদের লেখায় স্থান পেল নতুন নতুন বিষয় যা তারা সবলতর সঙ্গে সাহিত্যে তুলে আনলেন। প্রাবন্ধিক তাদের এই নব অভ্যুদয়কে অভিনন্দন করতে কুণ্ঠিত নন। প্রকৃত সাহিত্যে মহৎ তাতে আছে অসীমতা ও মহত্ব।

'বাস্তব' প্রবন্ধে রবীন্দ্র দৃষ্টিভঙ্গি

'বাস্তব' প্রবন্ধটি ১৩২১ বঙ্গাব্দের শ্রাবনমাসে 'সবুজপত্র পত্রিকায় প্রকাশিত। 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে তা সংকলিত হয়েছে। সাহিত্যে Realism শব্দটি অনেক পুরাতন এবং তার পরিধি বিস্তৃত। বস্তু সংলগ্ন বিষয়কে নিকটে স্থাপন করে লোকিক উত্তেজনা ভোগ করা কে Realism বলি। এটি বস্তুতান্ত্রিকতার চূড়ান্ত অবস্থা। মর্মগত জীবন সত্যের প্রকাশ প্রয়োজনমত। যথার্থতাকে লঙ্ঘন করে ভাবসত্যের প্রকাশ ও বাস্তবতা। বস্তুতান্ত্রিকতার নৈকট্যের জন্য বস্তুভাব প্রবল হয়ে বাস্তব সত্যকে বিকৃত করে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সত্যকে বিকৃত করে না। ঘোর বাস্তববাদ কে তিনি মন থেকে মানেন নি। সাহিত্যের মধ্যে যে বস্তুকে আমরা পেতে চাই সেটা 'রসবস্তু'। কবিগুরুর ভাষায় বাস্তবতা রসবস্তু ও রসসাহিত্যের অনুভবগম্য বিষয়-

"সাহিত্যের মধ্যে কোন্ বস্তুকে আমরা খুঁজি। ওস্তাদেরা বলিয়া থাকেন সেটা রসবস্তু। বলাবাহুল্য, একানে রসসাহিত্যের কথাই হইতেছে। এই রসটা এমন জিনিস যার বাস্তবতা সম্বন্ধে তর্ক উঠিলে হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায় এবং একপক্ষ অথবা উভয় পক্ষ ভূমিসাৎ হইলে ও কোনো মীমাংসা হয় না। এই রস জিনিসটা রসিকের

অপেক্ষা রাখে, কেবলমাত্র নিজের জোরে নিজেকে সে সপ্রমাণ করিতে পারে না।"

কবিগুরু বলতে চাইলেন শ্রষ্টার অন্তরের অনুভূতিই যথার্থ বাস্তব।

অনুকরনের অনুকরন একথা সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে প্লেটোর অভিমত। কিন্তু অ্যারিস্টটল এর বিরুদ্ধে প্রতিবাত স্বরূপ বললেন - Art is imitates. "সাহিত্যের বিচারক' প্রবন্ধে জানালেন -

" সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আর্শি নহে, কেবল সাহিত্য কেন, কোন কলা বিদ্যাই প্রকৃতির যথার্থ অনুকরন নহে।"

এ সম্পর্কে গোর্কি বললেন -

"মহৎ শিল্পীদের রচনায় মনে হয় বাস্তবতা ও রোমান্টিকতা বিমিশ্রিত হয়ে থাকে।"

'বাস্তব' প্রবন্ধে সাহিত্যের বাস্তবতা সম্বন্ধে জানা গেল সাহিত্যে আমরা রসবস্তুর অনুকরন করি। এ সহৃদয় হৃদয় সম্বাদি মনেরই অনুসন্ধান। প্রাচীন গ্রীক নাটকে রীতিগত বাস্তবতা ছিল না , ছিল বিষয় বস্তুর বাস্তবতা। তেমনি মধ্যযুগের রোমান্সের বিষয় বস্তুর বাস্তবতা ছিল না, ছিল রূপ রীতির বাস্তবতা, বাস্তবতার উপর সৃষ্টির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন হোমার, শেক্সপীয়র, রাবেল, স্তাঁদাল, ভালজাক, টলস্টয়, চেকভ প্রমুখেরা বাস্তব জগতের উপাদান সাহিত্যে তুলে আনলেন।

এই 'বাস্তব' শব্দটি দর্শন থেকেএসেছে। দর্শনে Realism কে কখনো Idialism এর বিপরীতার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। বহু ভাববাদী রোমান্টিকদের কাছে Realism শব্দটি বাহ্য বস্তু অনুকরন বলেই মনে করেন। বাস্তবতার এই অনুকরননাত্মক বিষয় টিকে 'বাস্তব' প্রবন্ধে বিষয়ীভূত করে বলেছিলেন -

"বাস্তবিকতা কাঁচ পোকার মত। আর্টের মধ্যে প্রবেশ করিলে তেলা পোকার মত তার অন্তরের সমস্ত রস নিশেষ করিয়া ফেলে।"

রবীন্দ্র সমকালে ইউরোপীয় সাহিত্যের এবং বাংলা সাহিত্যের কিছু তরুনদের মধ্যে বস্তুবাদ বা বস্তুতান্ত্রিকতার নাম করে যে ধরনের সাহিত্যের বহুল প্রচলন হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ তা প্রসন্ন মনে গ্রহন করেন নি। তরুন প্রজন্মের বাস্তবতা বোধকে সঠিক চোখে দেখার রাস্তা বাতলে দিলেন 'বাস্তব' প্রবন্ধে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

'বাস্তবতা' সম্বন্ধে রবীন্দ্রভাবনার একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। জীবনের তুচ্ছ ও মুখ্য জড়াজড়ি করে থাকে। এখানে আছে প্রকৃতির অপক্ষপাত ও প্রাচুর্য। একজন পরমাত্মীয় তার সমগ্র পরিচয় নিয়ে আমাদের কাছে দৃশ্যমান নন। সে ক্ষেত্রে যা কিছু তুচ্ছ তা বর্জন করে সত্যটুকু গ্রহণ করতে হয়। যা বর্জন করা হল তা কল্পনায় পূর্ন করে নিতে হবে। এতে ব্যাক্তি পরিচয় সম্পূর্ন হয়ে ওঠে। এ কারনে অযোধ্যার রামচন্দ্র অপেক্ষা বাল্মীকির রামচন্দ্র পূর্ন সত্য। এই সম্পূর্নরূপে জানা বিষয়টি সম্পর্কে কবিগুরু বললেন -

"সাহিত্য যাহা আমাদিগকে জানাইতে চায় তা সম্পূর্ন রূপে জানায়।"

বাস্তবের সতকে আহরণ করে এক বিশ্বজনীন অনুভূতির প্রকাশ ঘটে সাহিত্য শিল্পে। সাহিত্যের বিচারকে তাই রবীন্দ্রনাধ ঠাকুর জানালেন -

"জগতের উপর মনের কারখানা বসিয়াছে এবং মনের উপরে বিশ্বমানের কারখানা। সেই উপরের তলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি।"

শিল্প সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঘটাকে বাস্তবের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে হবে। বাস্তবে আসক্তির তফাৎ বোঝাতে গিয়ে বন্ধন মুক্তির প্রসঙ্গে জানালেন -

"ঘটনা যখন বাস্তবের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কল্পনার বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে উত্তির্ন হয় তখনই আমাদের মনের কাছে তার সাহিত্য হয় বিশুদ্ধ ও বাধাহীন।"

তথ্য ও সত্য

সাহিত্য 'তথ্য ও সত্য' একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। তথ্য এবং তার অন্তর্নিহিত রূপই সত্য। সত্য এমনই জিনিস যা বিষয়াতীত, অনির্বচনী, তথ্যের আনন্দ রূপই সত্য হয়ে প্রকাশ পায়। Historycal truth এবং Poctic truth সম্পর্কে ধারনা থাকা প্রয়োজন। সাহিত্যের সত্য আনন্দময় তা হৃদয় লালিত। তাতে অসত্য- অসম্পূর্নের কথা নেই। এই সত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যেমন আনন্দের কথা বলেছেন তেমনি সংলগ্ন আছে মঙ্গল।

"সৌন্দর্যমূর্তিই মঙ্গলের পূর্নমূতফি এবং মঙ্গল মূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্নস্বরুপ।"

সাহিত্যের সত্যকে কবিগুরু চিরন্তন সত্য বলেচেন। বাস্তবের সত্য কবির দৃষ্টিতে তথ্যাত্র। সাহিত্যের সত্যকে তিনি অন্তরের সত্য, প্রকৃত সত্য রূপে দেখেছেন।

'তথ্য ও সত্য' আলোচনার কালে উদাহরণ স্বরূপ বিদ্যাপতির পদ উল্লেখ করেছেন-

"যব গোধূলিসময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি,
নব জলধরে বিজুরিরেহা দ্বন্দ্বপসারি গেলি।'

এখানে তথ্য হল গোধূলি সময়, মন্দির, কৃষকমেঘ, বিদ্যুদ্দাম ও নায়িকা এইবিষয়টি কে অবলম্বন করে কবি যখন ছন্দে, রূপে রসে, উপমা-রূপক বাক্য বিন্যাসে ফুটিয়ে তোলেন তখনই তা অনির্বচনীয়, প্রকৃত সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। আরো সহজ উদাহরণ 'গোলাপ ফুল' নিয়ে দেওয়া যায়। গোলাপ ফুল এখানে তথ্য মাত্র আর তাকে দেখে অন্তরের মধ্যে যে সৌরভ আনন্দ রূপ ফুটে ওঠে তাই সত্য।

হৃদয়ানুভুতি, কল্পনা এবং আনন্দ উপলব্ধিতে সত্যের প্রকাশ, আসলে অনির্বচনায় সেই সোনার কাঠির স্পর্শই সত্য রূপ। সোনারতরী, কাব্যের 'আত্মসমর্পন' কবিতায় ছন্দবন্ধে আনন্দময় সত্তার কথা বললেন কবিগুরু-

"তোমার আনন্দগানে, আমি দিব সুর
যাহা জানি দু-একটি প্রীতি সুমধুর
অন্তরের ছন্দোগাথা; দুঃখের ক্রন্দনে
বাহিবে আসার কণ্ঠ বিষাদ বিধুব
তোমার কণ্ঠের সনে;"

কত গভীর হৃদয় অনুভুতির ফলে এমন আত্ম সমর্পন সত্যরূপ ধরতে পারে। রবীন্দ্রনাথ কোন বস্তুর হুবহু অনুকরনের কথা বলেননি, তিনি বললেন-

"যেমনটি আছে তেমনটির ভাব হচ্ছেতথ্য, সেই তথ্য থাকেঅবলম্বন করে থাকে সেই হচ্ছে সত্য।"

টিপ্পনী

টিপ্পনী

আধুনিক কাব্য

‘ সাহিত্যের পথে’ গ্রন্থের আধুনিক কাব্য গ্রন্থটি পরিচয় পত্রিকায় ১৩৩৯সালে বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত ।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আধুনিকতা নিয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচনা করেছেন। তৎসঙ্গে দেখা বিদেশের বহু স্বনাম ধন্য কবি সাহিত্যিকদের উদ্ধৃতি তুলে ধরে আধুনিক কাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এ ছাড়া প্রকৃত আধুনিকতা যে সর্বজনীন সর্বকালে তার সমাদর আছে সে কথা যেমন বলেছেন তেমনি মেকি আধুনিকতার জোর করে মাড়িয়ে দেওয়ার কথা ও আছে এই প্রবন্ধে।

আধুনিকতা সর্ম্পকে কবি গুরু জানালেন - ‘আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে ।’ আসলে এ হল নদীর বাঁক ফেরা । কত সহজ ভাবে কবি আধুনিকতাকে বোঝালেন। আধুনিকের সীমা নিয়ে সম্পর্কে জানা যায় - “পাঁজি মিলিয়ে মডার্নের সীমানা নির্ণয় করবে কে। এটা কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা”। হোমার, বাল্মীকি, সফোক্লোস, লিওনার্দোদা ভিঞ্চি, চৈতন্যদেব,চন্ডীদাস, Word Worth, Keats, প্রত্যেকে তার সমকালে তিনি আধুনিক। ১৯ শতকের রোমান্টিক ইংরেজি কবিরা প্রথাবদ্ধতা থেকে কবিতাকে মুক্তি দিলেন। এ সমস্ত কবিদের দৃষ্টি বাহ্যিকতা থেকে কবিতাকে মুক্তি দিলেন। এ সমস্ত কবিদের দৃষ্টি বাহ্যিকতা থেকে অন্তরমুখী হল। তাদের ব্যাক্তিগত সুখ দুখের বহিঃপ্রকাশ তাদের কাব্যে । ওয়াডস ওয়ার্থ এর বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে দুখের বহিঃপ্রকাশ তাদের কাব্যে। ওয়াডস ওয়ার্থ এর বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে আনন্দময় সত্তাকে খুঁজে পেলেন। কীটস সৌন্দর্যের অরন্যে ডুবে গেলেন আর শেলি এক ভাব তন্ময় জগতে পাড়ি জমালেন। এরা কি আধুনিক ? নিশ্চয় তা নয়, প্রত্যেকেই সমকালে আধুনিক।

“কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল উনিশ শতাব্দীতে, বিশ শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা। এই জন্যে কাব্য বস্তুর বাস্তবতার উপরেই ঝোঁক দেওয়া হয়। অলংকারের উপর নয়। কেননা অলংকরটা ব্যাক্তির নিজেরই রুচিকে প্রকাশ করে, খাঁটি বাস্তবতার জোর হচ্ছে বিষয়ের নিজের প্রকাশের জন্য।” একালের আধুনিক হল বিষয়ের আত্মতা নিয়ে। এই বস্তুবাদী বিষয় মুখী কবিদের কাবকে চিরকালের লালিত সৌন্দর্যকে ধ্বংস করেছেন। তাই তাদের কাব্যে এরকম বিকৃত ভাব এবং খাঁটি বাস্তবতা উঠে আসল।

অর্থাৎ কাব্যিক প্রকাশ ঘটল না। একালের জীবন যান্ত্রিকতা যুক্ত কবিতাতা

তেও ব্যস্ত যান্ত্রিকতার প্রতিচ্ছবি। T.S. Elion, Orick Johns, A.c. Lowell প্রমুখের কবিতায় তাই মরাগাছ, কানকো, পোড়ো মাটি, ভাঙা দেওয়াল, পশ্চিমা বাতাস, পুঁতিময় গন্ধ স্থান পেল।আধুনিক সাহিত্য সাবেক কালের কৌলিন্য লক্ষন তিরস্কার করল, জাত বাঁচিয়ে চলাকে অবজ্ঞার চোখে দেখল। তার বাচ বিচার নেও T.S এলিয়ট তার কবিতায় তা দেখালেন। আসলে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রবল অভিঘাতে সুরুচি, সুনীতি ও শোভনতার অবিশ্বাস দেখা গেল। এ গুলিকে কবি আধুনিক বলেননি আকস্মিক বিপ্লব জনিত চিত্তবিকার হিসাবে দেখেছেন।

টিপ্পনী

এই আধুনিক কবিরা বলতে পারেন -

"তুমি সুন্দরী, তুমি বানী।"

T. S. Eliot এর একটি কবিতার রবীন্দ্রকৃত তর্জমায় খাঁটি বাস্তবতার কথা -

" এ ঘরে ও ঘরে যাবার রাস্তায় সিদ্ধ মাংসর গন্ধ,

তাই নিয়ে শীতের সন্ধ্যা জমে এল।

এখন ছ'টা -

ধোঁয়াটে দিন, পোড়াবাতি, শেষ অংশে ঠেকল।"

A. C. Cowell লাল চটি সুতোর দোকান নিয়ে কবিতার বিষয় করে তুললেন 'red Slipeers'। এজরা পাইন্ড তার The Study in aesthetics কবিতায় নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ দেখা গেল। তার কাছে দেখার ক্ষেত্রে সুন্দরী ও সার্ডিন মাছ একই রকম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বললেন এ সকল হালের কায়দা পাঠকের মোহভঙ্গের উদ্দেশ্যে। তিনি Orick Johns এর 'Songs of Deliverance' কবিতার No pray am I অধ্যায়ে I am greatest laugher of all এ ব্যাঙের হাসির বিদ্রুপ করেছেন। এই ব্যাঙের হাসিকে জোনস কখনো সূর্যের হাসির সঙ্গে তুলনা করেছেন, আবার এ হাসি বিষাদ ঘনিয়ে তোলে। রবীন্দ্রনাথ কোন উগ্রতাকে বেমালুম ভাবে সনাতন প্রথা ভাঙাকে মেনে নিতে পারেন নি। এই ধরনের অতি আধুনিকতাকে তিনি মানসিক অসুস্থতা বলে মনে করেন। সৃষ্টি যে সর্বজনীনতা ও আনন্দ দায়ক হয়ে উঠবে সেকথা 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থের 'সাহিত্যে আধুনিকতায়' লিপিবদ্ধ করলেন -

"সাহিত্যে সর্বদেশে এই কথাই প্রমাণ করে আসছে যে, মানুষের

টিপ্পনী

আনন্দ নিকেতন চিরপুরাতন। কালিদাসের মেঘদূতে মানুষ আপন চিরপুরান বিরহ বেদনারই স্বাদ পেয়ে আনন্দিত। সেই চির পুরাতনের চির নূতনত্ব বহন করছে মানুষের সাহিত্য, মানুষের শিল্পকলা। এই জন্যেই মানুষের সাহিত্যে মানুষের শিল্পকলা সর্বমানবের। তাই বারে বারে এই কথা আমার মনে হয়েছে, বর্তমান ইংরেজি কাব্য উদ্ধৃতভাবে নূতন, পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহভাবে নূতন। যে তরুনের মন কালাপাহাড়ি সে এর নব্যতার মদির রসে মত্ত, কিন্তু নব্যতাই এর ক্ষনিকতার লক্ষণ।"

এধরনের উদ্দামতাময় কাব্য কে ক্ষনিকের বললেন, চিরস্থায়ী আসন তিনি দিলেন না। তাই তিনি আধুনিকতার নির্যাস হিসাবে যে কথা বললেন তা এই রকম -

"আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তা হলে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যাক্তিগত আসক্ত ভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তথগত ভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ; এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ।"

নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে বিশ্বকে দেখাতে বে তবেই তো সৃষ্টি রসবস্তু হয়ে উঠবে। সেই সৃষ্ট শিল্প সাহিত্য হয়ে উঠবে আধুনিক কালোত্তীর্ন সর্বজনীন।

আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থ অবলম্বনে সাহিত্যতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দাও।

২. 'বাস্তব' প্রবন্ধে প্রবন্ধকারের বক্তব্য পরিস্ফুট কর।

৩. 'তথ্য ও সত্য' বলতে প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ কি বুঝিয়েছেন ? তানিজের ভাষায় ব্যাখ্যা কর।

৪. 'আধুনিক কাব্য' অবলম্বনে রবীন্দ্রনাধের আধুনিকতার সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দাও।

৫. 'সাহিত্বে নবত্ব' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকের মূল বক্তব্য আলোচনা কর।

৬. "আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তা হলে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যাক্তিগত আসক্ত ভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্‌গত ভাবে দেখা।" - উক্তিটির যর্থাথতা নিরূপন কর।

৭. "গভির দুঃখ ভূসা, ট্রাজেড়ির মধ্যে সেই ভূসাআছে, সেই ভূমৈব সুখম" -

‘সাহিত্যের পথে’ গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দরনাথের উপরিউক্তক্তব্যের সারবস্তু আলোচনা কর।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী

ভূমিকা

টিপ্পনী

অবনীন্দ্রনাথ গুনী মহাজনশ্রেনী ভুক্ত। তিনি একনিষ্ট 'শিল্পী; শিল্প গুরু এবং শিল্পরসিক'। লুপ্ত ভারতীয় শিল্পকলা তাঁর প্রতিভা স্পর্শে নব নব চিন্তায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। শুধু ছবি এঁকে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেননি তিনি কথা দিয়ে ছবি আঁকলেন বাগীশ্বরী প্রবন্ধমালায়। অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় শিল্পকলার রূপতত্ত্ব ও রসতত্ত্বের ব্যাখ্যা করলেন তাঁর বাগীশ্বরী বক্তৃতা মালার মধ্যে। ১৯২১ - ২৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি যে সকল বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন তা ১৯৪১ সালে 'বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধবলী' নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক প্রকাশিত হয়।

ব্যাক্তি অবনীন্দ্রনাথের জ্ঞাতব্য তথ্যাবলী

জন্ম :

৭ই আগষ্ট ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে। স্থান - জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী, পিতা - গুনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেশ কিছু দিন সংস্কৃত কলেজে পাঠ নিয়েচিলেন। ঠাকুরবাড়ির শিল্পচর্চার পাশাপাশি পাশ্চাত্য অঙ্কন পদ্ধতির পাঠ ও নিয়েছিলেন। ভারতীয় শিল্প কলার উপরে তাঁরবিশেষ কৃতিত্ব আমাদের মুগ্ধ করে। কৃষ্ণলীলা সংক্রান্ত প্রথম চিত্রাবলী আঁকেন সম্পূর্ন ভারতীয় রীতিতে। তাঁর আঁকা ছবি দেশ বিদেশে প্রদর্শিত হয়েছে এবং যাদের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে ছিলেন সেই বিখ্যাত ব্যাক্তিত্ব হলেন - রদেন স্টাইন, ই বি হ্যাভেন, আনন্দ কুমার স্বামী, ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখ।

অবনীন্দ্রনাথ দীর্ঘদীন সরকারি আর্ট কলেজের সহধ্যাক্ষপদে নিযুক্ত ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রানী বাগীশ্বরী অধ্যাপক পদেও আসীন ছিলেন। এছাড়া বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিখ্যাত গ্রন্থ প্রণেতা বটে। যেমন - (১) শকুন্তলা, (২) ক্ষীরের পুতুল, (৩) নালক, (৪) শিলপায়ন, (৫) ঘরোয়া (৬) রাজকাহিনী (৭) আপন কথা (৮) ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ (৯) জোড়াসাঁকোর ধারে প্রভৃতি।

টিপ্পনী

তাঁর পিতা ছিলেন গুনী মানুষ, তিনি আর্ট স্কুলের কৃতি ছাত্র ছিলেন এবং চিত্রকলায় কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছিলেন।

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়ান ৫ ডিসেম্বর ১৯৫১।

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। বিষয় সূচীত হল -

শিল্পে অনধিকার, শিল্পে অধিকার, দৃষ্টি ও সৃষ্টি, শিল্প ও ভাষা, শিল্পো এর সবলতা ও অচলতা, সৌন্দর্যের সন্ধান, শিল্প ও দেহতত্ত্ব, অন্তরবাহির, মত ও মন্ত্র, সন্ধ্যার উৎসব, শিল্পশাস্ত্রের ক্রিয়াকান্ত, শিল্পীর ক্রিয়াকান্ত শিল্পের ক্রিয়া - প্রক্রিয়ার ভালমন্দ, রস ও রচনার ধারা, শিল্পবৃত্তি, সুন্দর, অসুন্দর, জাতি ও শিল্প, অরুপ না রূপ, রূপবিদ্যা, রূপদেখা, স্মৃতি ও শক্তি, আর্য ও অনার্য শিল্প, আর্য শিল্পের ক্রম, রূপ, খেলার পুতুল, রূপের মান ও পরিমান, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য, বর্ণিকাভঙ্গম।

উপরিউক্ত প্রবন্ধগুলি শিল্প গুরু অবনীন্দ্রনাথের বক্তৃতামালা । উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করলেন -

"আজ ভাবি, সেই সূদূর সুন্দরেরই বার্তা আনেএই বক্তৃতাবলী।"

নির্বাচিত প্রবন্ধ পর্যালোচনা

শিল্পে অনধিকার :

শিল্প সাধনা আলোচনা কালে যোগ সাধনার প্রসঙ্গ এনে বললেন -

"শিল্প সাধনার প্রকার - চোখ খুললেই রাখতেহয়, প্রাণকে জাগ্রত রাখতে হয়, মনকে পিঞ্জর - খোলা পাখির মতো মুক্তি দিতে হয় - কল্পনালোকে ও বাস্তবজগতে সুখে বিচরণ করতে ।" ..... এই সজাগ সাধনার কথা বলতে গিয়ে দেশী ও বিদেশী MILLET, BRACQUEMONT প্রমুখের উক্তি তুলে ধরেছেন।

"শিল্পের একটা মূলমন্ত্রই হচ্ছে 'নালমতিবিস্তরেন' । অতি - বিস্তরে যে অপর্যাপ্ত রস থাকে, তা নয়। অমৃত হয় একটি ফোঁটা, তৃপ্তি দেয় অফুরন্ত। আর ঐ অমৃতি জিলাবির বিস্তাঁর মস্ত, কিন্তু খেলে পেটটা মস্ত হয়ে ওঠে আর বুক চেপে ধরে বিষম রকম।" (পৃ-২)

অবীন্দ্রনাথ অনুসন্ধান বা খোঁজাতেই যে শিল্পীর আনন্দ, সেখানে বিজ্ঞাপন গৌনবিষয় হ্যান্ডবিল বিলির প্রয়োজন নিষ্ফল, তাঁর চেয়ে বরং -

"মনের ফুল বনের ফুলের সাথী হয়ে ফুটল, এর বেশি ও তো শিল্পীর দিক থেকে চাওয়ার প্রয়োজন নেই।" তাঁর ভাষায় -"শিল্পীর যথার্থ আনন্দ হচ্ছে ফোটার গৌরব।" শিল্পচর্চা একটা বোধ যা হৃদয়ের মধ্যে গড়েতুলতে হয় -

"শিল্পচর্চার গোড়ার পাঠ হচ্ছে শিল্প বোধ, যেমন শিশুশিক্ষার গোড়াতে হচ্ছে শিশুবোধ।'

তিনি রসবোধ ও শিল্প বোধের জাগরনের কথা বলেছে, প্রকৃত রস আহরণ করতে গেলে ঐ দুটি বোধ থাকা প্রয়োজন, না হলে শিল্পের রসভোগ সম্ভব নয়।

'শিল্পে অনধিকার' প্রবন্ধে শিল্পী ও কারিগরের চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন, শিল্পীকে মৌচাকের মধুযুক্তাঁর সঙ্গে বোলতাঁর চাকের মধুহীন সৌকর্যের সঙ্গে কারিগরের প্রসঙ্গ এনে। আরো একধাপ এগিয়ে বলেন -

"শিল্পীর কাজকে এই জন্য বলা হয় নির্মিত অর্থাৎ রসের দিক দিয়ে যেটি মিত হলেও অপরিমিত । আর কারিগরের কাজকে বলা হয় নির্মাণ অর্থাৎ নিঃশেষভাবে পরিমানের মধ্যে সেটি ধরা।"

শিল্পীর শিল্পকর্মকে বলা হয় 'অনন্যপরতাতন্ত্রা' দেশ-কাল ভেদে শিল্পের বৈচিত্র দেখা যায়। রোমক ও গ্রীক শিল্প সৃষ্টির পার্থক্য দক্ষতাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছেন । মানুষ তাঁর অন্তরের শিল্প সত্তাকে জানতে পারলে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে তাঁর বর্ণনা -

"যতদিন মানুষ জানেনি তাঁর নিজের মধ্যে কি চমৎকারিনি শক্তি রয়েছে সৃষ্টি করবার, ততদিন সে তাঁর চারিদিকের অরণ্যানীকে ভয় করে চলছিল, পর্বত শিখরকে ভাব ছিল দুরারোহ, ভীষন; বিশ্বরাজ্যের উপরে কোন প্রভুত্বই সে আশা করতে পারছিল না ; তাঁর কাছে সমস্তই বিরাট রহস্যের মতো ঠেকছিল ; সে চুপচাপ বসে ছিল। কিন্তু যে দিন শিল্পকে এ জানলো, সেই মুহুর্তেই তাঁর মন ছন্দোময় বেদময় হয়ে উঠল, রহস্যের দ্বারে গিয়ে সে ধাক্কা দিলে - সবলে।

আগুনকে সে বরন করে নিয়ে এল নিজের ঘরে ঘুমন্ত দেশের রাজকন্যার মতো সোনার কাঠির স্পর্শে জাগিয়ে তুলে। অমনি সঙ্গে সঙ্গে লোহার তাঁর ঘরে বেজে উঠল

টিপ্পনী

টিপ্পনী

তাঁর আশ্চর্য সুরে,.....

এই আনন্দেই মানুষ আবিষ্কার করলে সমস্ত কিছু। সৃষ্টি সঙ্গে রস ও আনন্দ আছে সেখানে অর্থের কোন সম্পর্ক নেই তাই অবনীশ্রনাথ যেন তেন প্রকারে অর্থ সংগ্রহকে হীন চোখে দেখেছেন। ভারতবর্ষের একটা ঐতিহ্য আছে - তাই- শিল্পীর অধিকার আমাদের পেতেই হবে, না হলে কিছুই পাবনা আমরা।"

আসলে শিল্প অধিকার শিল্প সৃষ্টি তো হ্লাদৈকময়ী আনন্দের প্রকাশ। প্রকৃত শিল্পীমনের পরিচয় দিতে গিয়ে জাপানের শ্রীমৎ ওকাকুবার কথা জোরের সহিত বললেন, রোমান্টিক শিল্পী রোদাঁর উক্তি সহ উদাহরন তুলে আনলেন। শিল্পে অধিকার পুরুষানুক্রমে হয় না -

"কেননা শিল্প হল 'নিয়তিকৃত - নিয়মরহিতা' বিধাতাঁর নিয়মের মধ্যে ও ধরা দিতে চয় না সে। নিজের নিয়মে সে চলে, শিল্পীকেও চালায়, দায় ভাগের দোহাই তে। তাঁর কাছে খাটবে না।" শিল্পে অধিকার নিজেকেই অর্জন করতে হয়, এমনি এমনি তা হয় না।

দৃষ্টি ও সৃষ্টি :

শ্রষ্টা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৈঠকী মেজাজে আলোচনা করেছেন 'দৃষ্টিও সৃষ্টি' বিষয়কে। এই প্রবন্ধে তিনি শ্রষ্টার সংবেদনশীল দিকটির প্রতি মনোনিবেশ করলেন। প্রথমেই তিনি দৃষ্টি কেমন হবে সে সম্পর্কে মতামত জ্ঞাপন করলেন। শিক্ষার বিষয়টীকে সর্বাগ্রে রেখে বললেন শিক্ষার যে তাঁরতম্য তা একজন সাধারণ মানুষের থেকে আর একজন শিল্পীর দেখাকে পৃথক করে দেয়। অর্থাৎ একজন প্রকৃত শিল্পীই সৃষ্টিকর্তাঁরসৃষ্টিকে বুঝতে সমর্থ হন। তাঁর পরিশিলিত মনে অভ্যাস এবং শিক্ষার পর্যায়ের ফলে সৃষ্টি কর্মকে বোঝা সম্ভব। শিল্পীর এই যে দৃষ্টিভঙ্গি তা অবনীন্দ্রনাথের চোখে তিন (৩) প্রকার - (ক) তীক্ষ্নদৃষ্টি (খ) অর্ন্তদৃষ্টি এবং (গ) দিব্যদৃষ্টি।

আমাদের শরীর যন্ত্র প্রবল ভাবে বস্তু পরায়ন। বাইরের জগতে যা দেখে তা বুদ্ধির কাছে পৌঁছে দেয়। বস্তুগত এই দৃষ্টিকে পরিশিলীত মননের চর্চায় প্রকৃত দৃষ্টিতে রূপান্তর করতে হয়। সাধারণ দেখা শোনার চাল চলনের বিপর্যয় না ঘটালে ছবি-সংগীত-কবিতা বোঝা সম্ভব নয়। দৃষ্টিশক্তির পরিবর্তনই তা সম্ভব বলে মনে করেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অভ্যাস ও শিক্ষা মানুষের দৃষ্টি ভঙ্গীকে সূক্ষ্ম ও গভীর করে তোলে।

তিনি শিশুকালের দৃষ্টিকে শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তুলনা করলেন। অতিমাত্রায় বস্তুগত দষ্টির Contrast এ এই দেখায় মন এবং কৌতুহল মিশে থাকে। দর্শন, স্পর্শনও শ্রবনের যান্ত্রিকতা দূর করে বুদ্ধির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে অন্তরের সঙ্গে সংযুক্ত করলে তখন ভেতরের প্রেরনায় অমনি বাইরের জিনিসকে দরদ দিয়ে দেখা শুরু হয়।

অন্তর দৃষ্টি সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলে অবনীন্দ্রনাথ জানালেন - "প্রাণের সঙ্গে বাক্যকে, চক্ষুর সঙ্গে মনকে, শ্রোত্রের সঙ্গে আত্মাকে .....।" মিলন ঘটাতে পারলে অন্তর দৃষ্টি লাভ করা সম্ভব। ভাবুকের আত্মভোলা , কাজ ভোলা দৃষ্টিকেই যথার্থ বলে মনে করেন। এই দেখাতেই সৃষ্টি তাঁর সমগ্রতা সহ আত্মপ্রকাশ করেল বস্তুগত দৃষ্টির সঙ্গে হৃদয় যুক্ত হয়ে সুপ্ত রসকে জাগিয়ে তোলে। বাইরের প্রেরণা সাপেক্ষ ইন্দ্রিয়ের কৌতুহল তো ভাবুকেরাই জাগিয়ে রাখতে পারেন। শিল্পী অর্থাৎ স্রষ্টাকে তো দেখতেই হবে। এই দৃষ্টির পর আর একটি কাজ আছে তা হল সৃষ্টি। স্রষ্টাই তো সুন্দরের পুজারী, তাঁরা অসুন্দরকে সুন্দর, নির্বাককে সবাক করে তোলে অর্থাৎ হ্লাদৈকময় অবস্থায় পৌঁছে দেয় সৃষ্টিকে।

শিল্পী তাঁর হৃদয়ের সৃষ্টি কর্মের জাগরনের মধ্যদিয়ে- 'দ্রষ্টা হয়ে বসল দ্বিতীয় স্রষ্টা।"নতুন সৃষ্টির আনন্দে শিল্পী থাকে বিভোর। যে কারনে অবনীন্দ্রনাথ কবি শিল্পীর দৃষ্টিকে 'দিব্যদৃষ্টি' বলেছেন। তুলির টানে মরু পাহাড় কে প্রাণ চঞ্চল করে তোলে শিল্পীমন। দিব্যদৃষ্টির অধিকারীরা পৃথিবীকে বর্ণ, ছন্দ ও সংগীতময় করে তোলে। এই দেখাটাই এমন শিল্পকর্ম হয়ে উঠবে যা আমাদের মানস চক্ষে জাগরুক থাকবে, তবেই হবে প্রকৃত সৃষ্টি। কবিগুরু শিল্পীকে বলেছিলেন 'রূপদক্ষ' এবং শিল্পকে বলেছিলেন 'শিল্পরূপ'। রোজার ফ্রাই বলেছিলেন Poetic Vision না থাকলে কোনোভাবেই Artistic design সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। মন দিয়ে দেখার সঙ্গে হৃদয় যুক্ত হয়ে দৃষ্টি সৃষ্টি উন্মুখ হয়ে ওঠে।

'দৃষ্টিও সৃষ্টি' প্রবন্ধে সংহতভাবে আলোচনার মধ্যদিয়ে রসের স্ফূরণ ঘটিয়েছেন। এখানে ছোট ছোট বাক্য মালার মতো সাজিয়ে উপস্থাপন করেছেন। 'Aesthetic' এর মত গুরু গম্ভির আলোচনা তিনি ছন্দময়তাঁর মধ্যে দিয়ে করলেন। Serious বিষয় টিকে শ্রোতা বা পাঠকের অনুকুলে এনে সহজ বোধ্য ভাবে তুলে ধরলেন।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সুন্দর

বহু বিতর্কিত বিষয় 'সুন্দর'। এই বিষয়টি নিয়ে ও শিল্প শুরু অবনীন্দ্রনাথের তাত্ত্বিক আলোচনা সমাদর পেয়েছে। 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' বিভিন্ন সময়ে দেওয়া বক্তৃতামালা বিশেষ। 'সুন্দর' প্রবন্ধে আমরা খুঁজে পাব সৌন্দর্যতাত্ত্বিক অবনসত্তাকে। 'সুন্দর', সৌন্দর্য বিষয়ক বিষয় নিয়ে কান্ট, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অ্যারিস্টটল, মার্কস আলোচনা করেছেন। কেউই নিদিষ্ট সংজ্ঞায় বেঁধে দেননি, তা হৃদয়ের ব্যাপার। অনুভব ও বোধের উপর নির্ভর করে অবনীন্দ্রনাথ 'সুন্দর' বিষয়টিকে আলোচনা করেছেন।

সুন্দর সম্পর্কে কয়েকটি জ্ঞাতব বিষয় হল-

- সুন্দর আসলে কি? নিজের কাছে যা ভালো বলে মনে হয় তাই সুন্দর। 'কি সুন্দর এবং কি সুন্দর নয়? এ নিয়ে বিতর্ক চলে না কারন-

"সবারই মনে একটা করে সুন্দর অসুন্দরের হিসেব ধরা রয়েছে।"

সুন্দর ধরা দেয় সকল দিকে, নানা সাজে, রূপে বর্ণে, সুর ছন্দে। ব্যক্তি বিশেষে সুন্দরের অর্থ ভিন্ন। একই বিষয় দেখে কেউ বলে ওঠে তুমি সুন্দর, আবার কেউ সুন্দরকে ধরতে পারে না। সৌন্দর্য সৃষ্টি তো হৃদয়ের ব্যাপার, মনের বিষয়।

- সংবেদনশীল মনই সুন্দরকে বুঝতে সমর্থ। সুন্দরের ক্ষেত্রে পরিবেশ ও সময় ভেদ গুরুত্বপূর্ন বিষয় তা বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক জানালেন-

"স্থান-কাল-পাত্রের হিসাবে সুন্দর অসুন্দর ঠেকে।" সুন্দরের ক্ষেত্রে দূরত্ব বিষয়টি উল্লেখযোগ্য - অর্থাৎ যান্ত্রিক কলাকৌশল থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

"দূরে থাকার দরুন অনেক জিনিস সুন্দর ঠেকে, দূরত্ব ঘুচিয়ে কাছে টেনে আনলেই তাদের সব সৌন্দর্য চলে যায়।"

সুন্দর ব্যক্তি মনের, সুন্দরের কাজ বৈচিত্র্য ও বিস্তাঁর তৈরি করা, বন্ধন মুক্তির মধ্যে তাকে ধরা যাব। সুন্দরকে কখনোই কোন কিছুর মধ্যে আবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। রূপদক্ষরাই সুন্দরকে যথার্থ রূপে ধরতে পারেন। ব্যাক্তিতে ব্যাক্তিতে যে দেখার দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর মধ্যে সুন্দর - অসুন্দর বোধ রয়েছে, বাইরের ও অন্তরের মিলনে - যে সোন্দর্য্য বা সুন্দর জাগ্রত তা বাহ্যিক আড়ম্বর শূন্য, সহজ সরল গতিই মুখ্য। মাটি থেকে

আকাশ সবখানে সুন্দরের আয়োজন বর্তমান। কিন্তু সুন্দরের মধ্যে একটা আড়াল থাকে ।পাখির ওড়ার কৌশল এখানে উদাহরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সুন্দর হল উপলব্ধির বিষয়। তাই অবনীন্দ্রনাথ বললেন -

"যে রচনায় রস রইলো সেই রচনাই সুন্দর হলো।'

'সুন্দর' প্রবন্ধ খুব স্বাভাবিক ভাবে, প্রচলিত শব্দ ব্যবহারে তিনি বাখ্যা করলেন সুন্দরের। অবনীন্দ্রনাথের জীবনের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক। কবি বিষ্ণু দে, অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বললেন-

"অবনীন্দ্রনাথের সত্তাঁর শিকড় এই বাংলার আদিম গভীরে।''

প্রতিটি বক্তৃতাঁর মধ্যে তাঁর শিল্প তাত্ত্বিক সত্তা খোঁজ পাওয়া যায়। সাহিত্যে, শিল্প, সৌন্দর্য নিয়ে বিখ্যাত ব্যাক্তিরা আলোচনা করেছেন যেমন - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'আর্য জাতির সূক্ষ শিল্প', রবীন্দ্রনাথের 'সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ', 'সৌন্দর্যবোধ', 'সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ', 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' প্রভৃতি প্রবন্ধের উল্লেখ করা যেতে পারে। 'পঞ্চভূতে' কবিগুরুর সৌন্দর্য সম্বন্ধে গুরুত্ব পূর্ন উক্তি -

"সৌন্দর্য আত্মার সহিত জড়ের মাঝখানকার সেতু।"

Plato সোন্দর্যকে স্বর্গীয় বলেছেন। এই সৌন্দর্য বা সুন্দর নির্বস্তুক নয়, প্রসঙ্গক্রমে তিনি শৃঙ্খল, সামঞ্জস্য ও স্পষ্টতাঁর কথা তুলে ধরলেন। শিল্প গুরু সুন্দর সম্পর্কে জানালেন মৌচাকে যেমন মধু, তেমনি ছবি মূর্তি, কবিতা, গান কত কি পাত্রে ধরলে মানুষ সুন্দরকে, এ দিকে আবার বিশ্বজগতে সুন্দর নিজেকে ধরে দিলেন আপনা হতেই ফুলে ফলে লতায় পাতায় জলে স্থলে, কত স্থানে।

অসুন্দর

সুন্দর - অসুন্দর ব্যাক্তিগত রুচির উপর নির্ভরশীল। এই দুয়ের পরিষ্কার পার্থক্য নির্নয় দুরুহ। সুন্দর প্রবন্ধে 'সুন্দর' বাহ্য বিষয় মনের বিষয় হয়ে রয়ে গেল। আর অসুন্দর মনের বিষয় হয়ে উঠতে পারল না বাইরের বিষয় হয়ে রইল। সুন্দরের প্রতিষ্ঠা সত্যের উপর আর অসুন্দর নিজেকে মিথ্যার আবরনে আচ্ছন্ন করে রাখে।

সুন্দর অসুন্দর আলোচনার সময় স্বার্থবুদ্ধি সম্বন্ধে জানা যায় একের পক্ষে যা অসুন্দর তা আসলে স্বার্থে ঘা দিচ্ছে বলে, অন্যের পক্ষে তাই সুন্দর হয়ে দেখা দিল স্বার্থে

টিপ্পনী

ঘা দেয়নি বলে। শিল্প হল সত্য - সুন্দরের প্রকাশ। আর যা ভালো তা সুন্দর ও অসত্য এমত আবার সকল সময় মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কেননা - আর্ট তাঁর সব উচ্চ উপকরন - প্রকরণ ভ্রান্তি উৎপাদন করে মায়াপুরী সৃজন করে চলেছে সুর, রঙ দিয়ে। জগৎ জুড়ে সুন্দর অসুন্দরের লীলা চলছে। যার মধ্যদিয়ে রহস্য স্ফুরিত হচ্ছে না। কোন বৈচিত্র্য আনয়ন ঘটছে না, যার চরিত্র নেই, যা কোন নতুন স্বাদ আস্বাদন করা যাচ্ছে না তাকে আমরা অসুন্দর বলি। বিশ্বরচনা সম্ভারে সুন্দর আছে, অসুন্দর ও আছে। শ্রষ্ঠাগন সুন্দর - অসুন্দর দুটোকেই সৌন্দর্যপরিস্ফুটনের কাজে লাগাচ্ছেন।

টিপ্পনী

শিল্পের অধিকার

যে বা যিনি শিল্পের চর্চা করছেন তিনিই শিল্পের অধিকারী। শিল্পের আয়োজন ও অধিকারের কথা বলতে গিয়ে বললেন অধিকার জিনিসটা আয়োজনের উপর নির্ভর করে না, ব্যাক্তি হিসাবে শিল্পীর একটা অধিকারবোধ বা স্বাতন্ত্র্যতা এখানে কাজ করে। আসলে একটা অপরিমিতি বোধ থেকে সৃষ্টি হয় Art এর। "মানব প্রকৃতি ও বিশ্ব প্রকৃতির দুইয়ের মিলনে শিল্পের উৎপত্তি।" শিল্পের অধিকারে শিল্প সত্তাঁর কথা বলতে গিয়ে কয়েকটি বিষয় তুলে আনলেন -

(১) আড়ম্বর শূন্যতা

(২) রসের তৃষ্ণা

অবনীন্দ্রনাথের যে শিল্প দৃষ্টিভঙ্গিতা ভাবুকের। শিল্পীর যে বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী দৃষ্টি থাকে তা শিল্প রচনায় আবশ্যিক। যেমন Aristotle মনে করেছেন ইতিহাসের মত Art এর সত্য জীবনের সত্য। কিন্তু ইতিহাসের সত্য (Historical truth) গভীরতর বা উচ্চতর সত্য। অবনীন্দ্রনাথ অনাড়ম্বরের মধ্য দিয়ে সত্যকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তিনি শিল্প সৃষ্টিতে বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টির অন্তর্নিহিত রস ও রূপ অনুধাবন করেছেন। রসের তৃষ্ণা অর্থাৎ রসিকে রসাস্বদনই মূল কথা। কে রসিক, কে রসিক নয় তাঁর স্পষ্ট মিমাংসা এখানে নেই। সকল রসিকের বিচার বুদ্ধি, তথ্য নিষ্ঠ, বিশ্লেষন শক্তি সমান নয়। যিনি যুগপৎ রসিক এবং তত্ত্বদর্শী শিল্প তত্ত্বের রাজ্যে একমাত্র তাঁরই অবাধ সঞ্চারনের অধিকার আছে।

অবনীন্দ্রনাথের মতে, "শিল্পের অধিকার নিজেকে অর্জন করতে হয়। পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধন যে আইনে আমাদের হয় তেমন করে শিল্প আমাদের হয় না।" -

এর জন্য প্রয়োজন শিল্পবোধ, রসবোধ এবং অনুভূতির প্রকাশ। শিল্পীকে অবশ্যই অর্জন করে নিতে হয় বাইরের বস্তু জগৎ এবং অন্তরের কল্পনার জগৎকে মিলিত করে সৌন্দর্যের সূত্রে মালা গাথার শক্তি। এই শক্তির অধিকার জন্মালেই পাওয়া যায় শিল্পের প্রকৃত অধিকার। শিল্পে অধিকার পাওয়ার জন্য অনন্ত অবসর, অনুকরন বা বিরাট আয়োজনের প্রয়োজন নেই, দরকার অনুশীলন ও রস চেতনা। রসের পিপাসা থাকলেই শিল্পে অধিকার লাভ সম্ভব।

টিপ্পনী

সৌন্দর্যের সন্ধান

'সৌন্দর্যের সন্ধান' প্রবন্ধে অবন্দ্রীনাথ দেখালেন রসিকের মনের অভ্যন্তরে সুন্দরের প্রকৃত অধিষ্ঠান।

প্রচন্ড জোরের সঙ্গে বলা প্রাবন্ধটিতে অনেক সময়ই তিনি তাত্ত্বিক পরম্পরা মানেননি। এটা অবশ্যই প্রবন্ধটির একটি দুর্বলতা। সেদিক থেকে সুন্দর অসুন্দর এবং সৌন্দর্য্যের সন্ধান এই তিনে মিলে অবনীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্যের সন্ধান।

(১) এই প্রবন্ধটি তিনি শুরু করেছেন সুন্দর অসুন্দরের তুলনা মূলক আলোচনা দিয়ে। সেক্ষেত্রে তিনি সুন্দর সম্পর্কে কোন ধ্রুবকে মানতে পারেন নি - "সুন্দরকে নিয়ে আমাদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ঘরকন্না।"

(২) জীবের মনস্তত্ত্বের মতই সুন্দর ও বিচিত্র ও অপরিমেয়। এক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোন ভারতীয় আনন্দবাদী দর্শনের কাছাকাছি। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কথা - "সৌন্দর্য আত্মার সহিত জড়ের মাঝখানকার সেতু।" (পঞ্চভূতঃ ক্ষিতির উক্তি)

(৩) তিনি মনে করেন সৌন্দর্য ব্যাপারটার কোনো চিরায়ত অবস্থান বিন্দু নেই। তবে স্বতন্ত্র আদর্শ থাকতেই পারে। কিন্তু তা আর্টিস্টের অন্তর্গত মননে।

(৪) আসলে মানুষতো অপূর্নতাঁর বোধ থেকেই পরিপূর্নতাঁর পানে ছুটে চলে। এক অনিবার্য প্রানাবেগের তাগিদে এই ছুটে চলাই সৌন্দর্যের সন্ধান। বৈষ্ণব সাহিত্যের অভিসারের মধ্যেও আমরা এই সুদুর্জয় প্রানাবেগকে উপলব্ধি করি। কীটস মনে করতেন পরিপূর্ন সোন্দর্য আর্টের মাধ্যমে চিরন্তন মূল্য পেতে পারে। তবে অবনীন্দ্রনাথ মনে করেন এই সৌন্দর্যকে সম্পূর্নভাবে আর্ট দিয়ে ধরা সম্ভব নয়।

টিপ্পনী

(৫) সাধারনভাবে যা কিছু ভালো তাঁর সঙ্গেই সুন্দরকে জড়িয়ে নেওয়া হয়। পরমসুন্দরের মধ্যে লুকোচুরি খেলার ব্যাপারটা থাকে না বলেই তিনি মনে করেন।

(৬) অবনীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটির প্রাথমিক পর্বে সৌন্দর্য সম্পর্কে যে কথাগুলি বললেন তাঁর অনেকগুলি 'সুন্দর' এবং 'অসুন্দর' প্রবন্ধের পুনরাবৃত্তি মাত্র। তিনি বোধ হয় এখানে একটা অভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চাইছেন। তিনি সুন্দর সম্পর্কে প্রচলিত মতকে স্মরণ করেছেন। -

(ক) যা সুখদয় তাই সুন্দর

(খ) যা কাজের তাই সুন্দর

(গ) যা অপরিমিত তাকেই বলে সুন্দর।

(ঘ) যা সুশৃঙ্খল তাই সুন্দর

(ঙ) যা সুসংহত তাই সুন্দর

(চ) বিচিত্র অবিচিত্র সমবিষয় দুই নিয়ে ইনি সুন্দর। ইত্যাদি

(৭) তিনি রুচির প্রসঙ্গ এনে বলেছেন দিন বদলের সঙ্গে যেমন রুচি বদলায় সুন্দর সম্পর্কে ধারনাও তো পরিবর্তন শীল। অতএব এ সংক্রান্ত বোধও আপেক্ষিক ভূমির উপর দাঁড়িয়ে থাকে। সৌন্দর্য্যের সন্ধানের সঙ্গে এরকম রুচির প্রসঙ্গ জুড়ে তিনি পরবর্তী সন্ধান প্রক্রিয়াকে এক অভিনব মাত্রা দিলেন।

(৮) তবে আমরা কাকে সুন্দরের আদর্শ হিসাবে নেব? এক্ষেত্রে তিনি মানুষের মনের নিত্য ও সুন্দর প্রাণের স্রোতকে অবলোকন করতে বললেন।

(৯) আসলে অবাধ স্রোতে সুন্দর অসুন্দরকে বোঝার উৎকৃষ্ঠ উপায় প্রত্যেককেই আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে খুঁজে নিতে হয়। স্বভাবতই সৌন্দর্য্যের সন্ধান কোন ধ্রুব ব্যাপার নয়।

এই প্রবন্ধে তিনি অনেকগুলি অনুষঙ্গ এনে যুক্তিতে পৌঁছাতে চেয়েছেন। অন্য প্রবন্ধগুলির মতো এখানে ও বৈঠকী মেজাজ এবং গল্প কথকতাঁর ঢঙ অনুসৃত। এছাড়া Humour ও Fun তৈরী করার ব্যাপার লক্ষ্য করি। গদ্যে আবেগ সন্ধার করার জন্যেই তিনি কি তাঁর ধর্মকে প্রবন্ধের বন্ধনে আনতে চান আর এসব মিললে এটি এক মনোজ্ঞ আলোচনা হয়ে ওঠে।

অবনীন্দ্রনাথ 'শিল্প ও ভাষা' প্রবন্ধে শিক্ষা ও ভাষা সম্পর্কে সহজ ব্যাখ্যা তুলে ধরলেন। দেবী সরস্বতির উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলী দেবার 'ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে"। সবাই বুঝবে কারণ এ শ্লোক ছোট থেকে শুনে অভ্যস্ত সে যতই সংস্কৃত ভাষা হোক না কেন। কিন্তু ভারতী পত্রিকার একটা ছবি সবার সামনে মেলে ধরলে বেশি ভাগ লোক বলবে 'বুঝলেম না মশাই' যে হেতু Artist এর চিত্রের ভাষার জ্ঞান আমাদের নেই তাই বোধগম্য হল না। আবার একজন চীনা মানুষের কাছে সরস্বতীর স্তোত্র তাঁরস্বরে বললে যে তাঁর কিছুই বুঝবে না কিন্তু ছবির ভাষায় বললে সে সহজে অনুধাবন করতে সক্ষম।

ভাষা, শিল্পকে একটা সাজিয়ে, গুছিয়ে ছন্দ মেনে চলতে হবে। সকলকে নিজস্ব শৈলিমেনে হাঁটতে হবে। "শব্দের সঙ্গে রুপকে জড়িয়ে নিয়ে বাক্য যদি হল উচ্চারিত ছবি, তবে ছবি হল রূপের রেখার রঙের সঙ্গে কথাকে জড়িয়ে নিয়ে - রূপকথা, অভিনেতাঁর ভাষাকে ও তেমনি বলতে পারো রূপের চলা বলা নিয়ে চলন্তি ভাষা। কবিতাঁর ছবির অভিনয়ের ভাষার মতো সুর আর রুপ দিবে বাক্য সমূহকে যথোপযুক্ত স্থান - কাল - পাত্র ভেদে অভিনেতাঁর ও অভিনেত্রীর মতো সাজিয়ে গুছিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে ছেড়ে দিলে তবেই যাত্রা শুরু করে দিলে বাক্যগুলো চলল ছন্দ ধরে।"

তিনি রঙের ভাষার স্বাধীনতাঁর কথা বলতে গিয়ে তাঁর ক্ষমতাঁর কথা তুলে আনলেন যেমন আকাশের রূপ নেই কিন্তু সে রঙের আভাস দিয়ে কথা বলে। আরো সহজ করে বলেছেন -

"মধুর বাক্যগুলো কানের জিনিস হলে ও মাধবিলতাঁর মতো চোখের দেখা সহকারকে আশ্রয় করে পারে না।"

অবনীন্দ্রনাথ 'শিল্প ও ভাষা' প্রবন্ধে ভাষা ও শিল্পের কথিত রূপ ও শ্রেনী নিয়ে বললেন পন্ডিত কতৃক কথিত ভাষা রূপ - সংস্কৃত , প্রাকৃত, মিশ্র সংস্খৃত ভাষা আর বিভাষা। আর্টের (Art) ক্ষেত্রে ও তেমনি শাস্ত্রীয় শিক্ষা (Academic art), লোকশিল্প (Folk art), পরশিল্প (Foreign art), মিশ্র শিল্প প্রভৃতি। লোক শিল্পের ভাষার ক্ষেত্রে পটপাতা, গহনাগাটি, ঘটিবাটি প্রভৃতি art এর লক্ষনের সঙ্গে না মিললে মন হরণ করে। প্রতিটি বিষয়ে মধ্যে গিয়ে বিষয়টি বুঝতেহবে তা না হলে কলের গানের মত অবস্থা প্রাপ্ত হতে য় যেমন-

"সুরের ভাষা যে না বোঝে সঙ্গিত তাঁর কাছে প্রকান্ড প্রহেলিকা

টিপ্পনী

দুর্বোধ শব্দ মাত্র।'

অবনীন্দ্রনাথ মানুষের মনের গতির সঙ্গে ভাষার বদল অনুভব করেছেন। ছবির ভাষার সঙ্গে চলিত ভাষার সম্পর্ক তুলেএনে চলমানতাঁর বিজয় ঘোষনা করলেন -

টিপ্পনী

"বাঙ্গালার পক্ষে সংস্কৃতমূলক সাধুভাষা হল অচল ভাষা, কেননা সে শব্দকোষ ব্যকরণ ইত্যাদির মধ্যে একেবারে বাঁধা, মনের চেয়ে পুঁথির যোগ বেশি। বাঙালীর মন বাঙ্গালার জুড়ে আছে , সুতরাং চলতি বাঙ্গলা চলছে ও চলবে চিরকাল বাঙ্গালির মনের গতির সঙ্গে নানা দিক থেকে নানা জিনিসে যুক্ত হতে হতে, ঠিক জলের ধারা যেমন চলে দেশ - বিদেশের মধ্য দিয়ে। ছবির দিক দিয়ে ও এই বাঙ্গালার একটা চলিত ভাষা সৃষ্টি হয়ে ওঠা চাই, না হলে কোন কালের অজান্তাঁর ছবির ভাষায় কি মোগলের ভাষায় অথবা খালি বিদেশের ভাষায় আটকে থাকা চলবে না।"

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'অরূপ না রূপ' প্রবন্ধে বীনা দেখা যায় কিন্তু তাঁর সুরকে দেখা যায় না, অনুভব করা যায় দেখার সঙ্গে না দেখা জড়িয়ে আছে এখানে এতো অরূপ। রূপ আমাদের সবার চোখে ধরা পড়ে কিন্তু তাঁর মাধুরী সবার চোখে পড়ে না। তিনি রূপের মধ্যে তিনটি জিনিসের কথা বললেন - তাঁর আকার প্রকার, তাঁর অন্তরনিহিত ভাব, আর একটি হল দুইয়ে জড়িয়ে যে মাধুরী ফুটে উঠল সেটি। এই প্রবন্ধে ছবি, সংগীত, কালিদাস, উজ্জলনীলমনি, প্রভৃতি প্রসঙ্গ এনেছেন। আর্য ও অনার্য শিল্প প্রবন্ধে তাদের শিল্প রুচির পরিচয় দিয়েছেন। 'আর্য ও অনার্য শিল্প' সম্বন্ধে প্রবন্ধের অন্তিমে বললেন - 'আর্য শিল্পের অন্তরে অনার্য শিল্পের প্রাণ বিজের মতো লুকিয়ে রয়েছে - তাকে ফেলে হয়তো রস পেতে পারি, কিন্তু সে যদি বাদ যেত আরম্ভের একেবারে তবে নিস্ফলা হল আর্যসভ্যতা এটা নিশ্চয়।"

নন্দন তাত্ত্বিক অবনীন্দ্রনাথ

এক দিকে চিত্র শিল্পী, অন্যদিকে তিনি নন্দন তাত্ত্বিক। 'নন্দন' শব্দটি 'নন্দ' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন, অর্থাৎ যা আমাদের নন্দিত করে, সার্থক শিল্প আমাদের নন্দিত করে বস্তুগত ভাবে, শুধু দেখা নয় হৃদয় দিয়ে তাকে অনুভব প্রয়োজন। শিল্পের উপাদান সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে কিন্তু বদল হচ্ছে না মানুষের নান্দনিক বোধের। অবনীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য কে ব্যাক্তির আপন উপলব্ধির ব্যাপার মনে করেন। তিনি ভারতীয় শিল্প সাধনার ঐতিহ্যকে বিশ্ববাসীর অরবিন্দে যুক্ত করলেন। ভারতীয় শিল্প তাত্ত্বিক কুমার

স্বামী অবনীন্দ্রনাথের শিল্প কলার মধ্যে দেখলেন -

"খাটি ভারতীয়ত্বকে।"

অবনীন্দ্রনাথ 'সৌন্দর্য্যের সন্ধান' প্রবন্ধে বললেন সুন্দর অসুন্দরকে বঝার উৎকৃষ্ট উপায় প্রত্যেককে নিজে খুঁজে নিতে হয়। শিল্পসৃষ্টির রহস্যকে জন্মগত বা প্রথাগত বললে মনে করেন না। 'শিল্পের অধিকার' প্রবন্ধে শিল্প যে 'অনন্যপরতন্ত্রা' এবং 'নিয়তি কৃতনিয়ম রহিতা' তাঁরই সমর্থন মেলে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যখন নন্দনতত্ত্বের পর্যালোচনার মধ্যগগনে তখন অবনীন্দ্রনাথ 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' রচনা করলেন , সাধারণ ভাবে বাংলার আকাশ বাতাস রবীন্দ্র সৌরভে তখন সুরভিত আর তাঁর প্রভাব পড়েছে অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্ব আলোচনায়। বিশেষ করে মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ যেখানে সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন, অবনীন্দ্রনাথ সেখানে শিল্পতত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। তিনি প্রতিটি প্রবন্ধে উদাহরন ও উদ্ধৃতি সহযোগে বিষয়টি সহজ ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছেন।

অবনীন্দ্রনাথ নন্দনতত্ত্ব আলোচনা বেশি করে উঠেছে বিশেষ কয়েকটি প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে। সেগুলি আবার শিল্প তত্ত্ব ও সৌন্দর্য তত্ত্বকে কেন্দ্র করে রচিত। যেমন -

- শিল্পের অধিকার
- শিল্পের অনধিকার
- দৃষ্টি ও সৃষ্টি
- সৌন্দর্যের সন্ধান
- সুন্দর
- অসুন্দর

'সৌন্দর্য্যের সন্ধান' প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ আধুনিক পন্ডিত দের সৌন্দর্য সম্পর্কিত সংজ্ঞা গুলি আলোচনা করে বলেছেন এই সব সংঞ্জার দ্বারা সুন্দরঠিক ধরা সম্ভব নয়। শিল্পের যে সকল বিধি তাদের ব্যবহারিক ও প্রয়োজনের দিকটিতে তিনি খুব গুরুত্ব দিয়েছিলেন বলে মনে হয় , পন্ডিতদের শিল্প সংক্রান্ত সংজ্ঞা বিচার করতে গিয়ে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

তিনি দুটি শব্দ বললেন - (১) 'মত' (২) 'মন্ত্র'। শিল্পাদর্শ সম্পর্কে ব্যাক্তি বিশেষের বিবৃতিমূলক যে সংজ্ঞা তা - 'মত'। সকলের পক্ষে গ্রহন যোগ্য ও সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ন এবং শিলপের মর্ম প্রকাশক যে সংঞ্জা তা 'মন্ত্র'। তত্ত্বগত আলোচনায় সুন্দর- অসুন্দর সম্পর্কে জানালেন প্রত্যেক মানুষের মনে সুন্দর অসুন্দর সম্বন্ধে একতা ধারনা আছে, যা দিয়ে সে কোন বস্তুকে সুন্দর ও অসুন্দর বলে। ব্যাক্তিগত রুচি ও ধারনার উপর তা নির্ভর করে।

'অসুন্দর' প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বললেন- বাইরের ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রবেশ করে কোন জিনিস যখন অন্তর ইন্দ্রিয়ের হয়ে ওঠে তখনই তা সুন্দর। তাইতো তিনি বলতে পারেন জগতে সুন্দর অসুন্দর জড়াজড়ি করে আছে, ওস্তাদের হাতে পড়ে অসুন্দর ও সুন্দর হয়ে ওঠে। 'শিল্পের অধিকার' প্রবন্ধে আছে শিল্পীর প্রান সর্বদা জাগ্রত থাকবে এবং মন কল্পনা ও বাস্তবলোকে বিচরণ করবে। তবে শিল্পীর স্বাধীনতাঁর কথা তিনি স্বিকার করেন। শিল্পীর কর্ম নির্মিত অর্থাৎ রসের দিক থেকে 'অপরিমিত'। অপর দিকে কারিগরের কাজ 'নির্মান' যা পরিমিত।

অবনীন্দ্রনাথ শিল্প তত্ত্ব চিন্তায় চরম বস্তুবাদী বা চরম ভাববাদী নন। তিনি মনে করেন বাইরের রূপ আর অন্তরের মাধুরী পরস্পর নির্ভরশীল এ দুয়ের সামঞ্জস্যই নান্দনিক অভিজ্ঞতাঁর বৈশিষ্ট্য। শিল্প সৃষ্টিতে সৃজনশীল নন্দন শক্তিকে মেনে নিয়েছেন। 'দৃষ্টি' ও 'সৃষ্টি' প্রবন্ধে প্রথমে দেখা পরে সৌন্দর্য সৃষ্টির কথা বলেছেন অর্থাৎ এর মধ্যে আছে - 'Innoration'। সুন্দরকে তিনি মনের ব্যাপার বলেছেন। এ সম্বন্ধে তিনি বললেন -

সুন্দর উপলব্ধি অনুভূতির তাঁরতম্য অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

পরিবেশপরিস্থিতি ও সুন্দর বোধে নিয়ন্ত্রন করে।

সুন্দর উপলব্ধির জন্য তিনি দূরত্বকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

যান্ত্রিক কলা কৌশল থেকে দূরে থাকতে হবে এবং সুন্দরের ক্ষেত্রে বিস্তাঁর প্রয়োজন। সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্য বিরাট আয়োজনের ও প্রয়োজন নেই।

এভাবেই তিনি সৃষ্টি করলেন নন্দন তত্ত্বের জগৎ।

আদর্শ প্রশ্নাবলী

১ । বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলীতে পাঠ্য প্রবন্ধ গুলির আলেকে নন্দন তাত্ত্বিক অবনীন্দ্রনাথের পরিচয় জ্ঞাপন কর।

২। সুন্দর অসুন্দর প্রবন্ধের বিষয় বস্তু পর্যালোচনা কর।

৩। 'সৌন্দর্য্যের সন্ধান' সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দাও।

৪। 'শিল্পের অধিকার' ও 'অনধিকার সম্বন্ধে' প্রবন্ধ দুটিতে যে নন্দন তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন তা ব্যাখ্যা কর।

৫। 'দৃষ্টি ও সরষ্টি' প্রবন্ধে শ্রষ্টার সংবেদনের দিকটি প্রবন্ধকার ছুঁতে চেয়েছেন তা আলোচনা কর।

৬। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধবলীতে অবনীন্দ্রনাথের মুল বক্তব্য ব্যাখ্যা কর।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

তৃতীয় একক

অ্যারিস্টটলের পেয়োটিকস

টিপ্পনী

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৪ অব্দে প্রাচীন গ্রীসের ম্যাসিডন রাজ্যের স্ট্যাগিরা শহরে জন্মগ্রহন করেন। পিতা - নিকোমেকাস পেশায় একজন চিকিৎসক ছিলেন। অ্যারিস্টটল কিছুদিন আলেকজান্ডারের গৃহশিক্ষক ছিলেন এমন মতবাদ প্রচলিত আছে। গ্রীক দার্শনিক প্লোটো অ্যারিস্টটলকে 'Nous' অর্থাৎ মূর্তি মান মনীষা' বলে অভিহিত করেন। কারন শিল্প ভাবনায় অ্যারিস্টটলের অবদান বিশ্বজোড়া খ্যাতির অধিকারী অ্যারিস্টটলের পেয়েটিক্স বা' কাব্যতত্ত্বের গ্রন্থে কাব্য ভাবনার চুড়ান্ত রূপ লক্ষ করা যায়, অ্যারিস্টটলের 'কাব্যতত্ত্ব' বা পেয়েটিকস' একটি ছোট গ্রন্থ বা গ্রন্থের 'খসড়া' বলা চলে। অ্যারিস্টটল রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ১৭০ টি। বিজ্ঞান শাস্ত্র, তর্ক শাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র ও সাহিত্য শিল্প বিষয়ে রচিত তাঁর গ্রন্থগুলি পৃথিবীতে শ্রষ্ঠত্বের দাবী রাখে।

পেয়েটিকস (Poetics) শব্দটির বাংলাঅর্থ 'কাব্যতত্ত্ব' বা 'কাব্যনির্মান বিদ্যা'। এটি পোয়েটিকস্ নামে সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়ে আছে। শুধুমাত্র গ্রীক সাহিত্যের আলোচনা এখানে লিপিবদ্ধ হয় নি, সারা বিশ্বের সমস্ত ভাষার কাব্য ভাবনার সুর বা সুত্রে এতে লিপিবদ্ধ। তাই অ্যারিস্টটলকে "রীতিসিদ্ধ বাক্য ভাবনার আদি প্রবর্তক" বলা হয়ে থাকে।

অ্যারিস্টটল মূলত হোমার, সোফোক্লিস, ইস্কিইলাস, অ্যাগাথন, ইউরিপিদিস প্রমুখ ব্যাক্তিদের কাব্যভাবনাকে সামনে রেখে 'কাব্যতত্ত্বের' বিভিন্ন সুত্রে রচনা করেছিলেন। ঐ সমস্ত কবিদের কাব্য ভাবনা তথা কাব্যরস অ্যারিস্টটলের মনে একটি স্বতন্ত্র্য জগৎ সৃষ্টি করেছিল। যার থেকে তিনি সরষ্টি করেচিলেন একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র। যে শাস্ত্রটি কাব্যশাস্ত্র বা 'Poctics' 'পোয়েটিক্স' নামে পরিচিত।

পোয়েটিকস্ গ্রন্থটিকে শিল্প নির্মাণ কৌশল সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায় পোয়েটিক্স গ্রন্থটি শুরু হয়েছে অনুকরণ দিয়ে আর এর সমাপ্তি ট্রাজেডি ও মহাকাব্যের আলোচনা ভাস্বর।

অ্যারিস্টটলের Poctics গ্রন্থটি ২৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত। যার প্রথম ৩টি অধ্যায়ে

টিপ্পনী

কাব্যের অনুকরন রীতি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কাব্যের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা আচছে চতুর্থ অধ্যায়ে। পঞ্চম অধ্যায়ে কমেডির উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা আছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে ট্রাজেডি সম্পর্কে বিস্তৃত আছে। প্রসঙ্গ ক্রমে স্থান পেয়েছে Plot (কাহিনী); Character (চরিত্র), Thought (চিন্তন), Diction (বাচন), Spectacle (দৃশ্যসজ্জা), Melody (সঙ্গিত) । সপ্তম থেকে ষোলতম পরিচ্ছেদে ট্রাজেডির বিভিন্ন দিক আকার আয়তন, ঐক্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। সতোর ও আঠারোতম অধ্যায়ে ট্রাজেডী রচনার নির্দেশাবলী স্থান পেয়েছে । উনিশতম অধ্যায়ে ট্রাজেডির বচন ক্রিয়া স্থান পেয়েছে । কুড়ি থেকে বাইশতম অধ্যায়ে আছে ভাষাতত্ত্ব কেন্দ্রিক আলোচনা। তেইশ ও চব্বিশতম অধ্যায়ে মহাকাব্যের আকার, আয়তন ও ট্রাজেড়ির সাথে তূলনামূলক আলোচনা আছে, পঁচিশতম অধ্যায়ে সাহিত্য সমালোচনায় তত্ত্ব যোগ হয়েছে। আর ছাব্বিশতম তথা শেষ অধ্যায়ে মহাকাব্যের সাথে ট্রাজেড়িয় তুলনামুলক আলোচনায় ট্রাজেডিকেই শ্রেষ্ঠ বলে তিনি প্রমান করেছেন।

অনুকরন (Mimesis)

প্লেটো অ্যারিস্টটল উভয়েরমতানুসারে শিল্প অনুকরন । অ্যারিস্টটল তাঁর পোয়েটিকস্ গ্রন্থের সূচনায় কাব্যের স্বরূপ, শ্রেনীবিভাগ, বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি দেখতে চেয়েছেন। সেই সাথে কাব্যের সার্থকতা বিভিন্নশ্রেনীর মধ্যে পার্থক্য, প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন মহাকাব্য ট্রাজেডি, কমেডি এসব কিছুকেই সাধারনভাবে বলা চলে অনুকরণ।

বাংলায় যাকে 'অনুকরন' বলা হয় ইংরেজীতে তাকে বলা হয় 'ইমিটেশান'। ইমিটেশান শব্দটি ল্যাটিন 'Imitation' শব্দটি থেকে এসেছে। এর মূল গ্রীক শব্দ মাইমেসিস (Mimesis) । অনুকরন কথাটি শুনলে মনে হয় সেখানে স্বাধীন কল্পনার অবসর নেই, এ যান "যদ্দৃস্টর, তল্লিখিত্য" অবস্থা। তবে অ্যারিস্টটল একথা বলেননি। অ্যারিস্টটলের অনুকরন সম্পর্কে ধারনাই বর্তমান বিশ্বের সর্বত্র স্বীকৃত । তবে অনুকরনকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যতে পারে - (ক) আক্ষরিক অনুকরন ও (খ) সৃজনাত্মক অনুকরন।

অ্যারিস্টটল কাব্যতত্ত্ব গ্রন্থে ট্রাজেডি প্রসঙ্গ সূত্রে অনুকরন শব্দটি ব্যবহার

করেছেন। তবে সমালোচনার পরিভাষায় ইমিটেশন শব্দটি দুটি ভাগে প্রযুক্ত হয়েছে। একই অর্থ - সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্প প্রকৃতির নিরুপনের সঙ্গে যুক্ত। এবং অন্য অর্থ ইমিটেশন দুটি রচনার মধ্যে যে অনুকারী রচনা তাঁর সঙ্গে পূর্বজ আদর্শ রচানাটির সম্পর্ক বোঝানোর জন্য প্রযুক্ত রয়েছে।

টিপ্পনী

প্লেটোর ধারনা অনুযায়ী শিলপের অনুকরন হলো 'আক্ষরিক অনুকরন'। আর অ্যারিস্টটল শিল্পের অনুকরন বলতে'সৃজনাত্মক অনুকরনকেই বুঝিয়ে দেন। অ্যারিস্টটলের মতে Imitation বা 'অনুকরন' হল - 'A Creative act" অর্থাৎ শিল্প হল সৃজনাত্মক কাজ। বা Creativity আবার এই অনুকরন হল প্রকৃতি ও জীবনে প্রতিরূপ ধারনার প্রকাশ।

অ্যারিস্টটল তাঁর পেয়োটিকস গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সঙ্গীতকে অনুকরনাত্মক শিল্প বলে অভিহিত করেছেন। প্লেটোর ধারনা অনুযায়ী অনুকরন যদি আক্ষরিক হত তবে সঙ্গীতের মধ্যে কোন উৎসাহ খুঁজে পাওয়া যেত না। তাই অ্যারিস্টটলের ধারনা অনুযায়ী সঙ্গীতের সুরই প্রধান। এই সুর শিল্পীয় একান্ত নিজস্ব এবং তা সৃজনাত্মক। অ্যারিস্টটল তাঁর আলোচনায় মানব জীবনের শৈল্পিক অনুকরনকেই মুখ্য বা প্রধান হিসাবে ধরেছেন। শিল্পীরা যখন কোন মানব জীবনের চরিত্রের ভালো মন্দ রুপ বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলেন। তবে অ্যারিস্টটলের মতানুসারে মানবজীবন যেমন তেমনটি শিল্পে কখনই তুলে ধরা উচিত নয়। সেই মানুষের একটি নতুন তর রূপ ফুটিয়ে তোলা শিল্পীর কাজ। সেটা ভালো হতে পারে আবার মন্দ ও হতে পারে অর্থাৎ বাস্তব জীবনের কোন ঘটনা শিল্পী তাঁর মনের ভিতরে আগে গ্রহন করেন। তাঁর পর শিল্পী আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে অর্থাৎ সত্যকে বা মিথ্যা বা কল্পনা যোগ করে নতুন তর প্রতীকের মাধ্যমে তা আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেন। সেই উপস্থাব্য বিষয় শিল্পী বস্তুজগতের বিষয় বস্তুকে ঝাড়াই বাছাই করে স্বতন্ত্র রূপ দেন। অ্যারিস্টটল যাকে "Oraganic Structure" বলেছেন। অ্যারিস্টটলের মতে ব্যাক্তি গত আবেগ উচ্ছাস, সুখ-দুখ কে কখনই অনুকরন করা যায় না। নতুন সৃষ্টির মাধ্যমে তা সর্বজনীন হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গ ক্রমে অ্যারিস্টটল ইতিহাসের কথা তুলে ধরেছেন, তবে ইতিহাস ও কাব্য বস্তু জগতকে অনুসরন করে। তবে ইতিহাসের সত্য বিশেষ দেশ কাল ও পাত্রের সীমায় সীমাবদ্ধ। কিন্তু কাব্যের সত্য সর্বজনীন। কাব্যে সামান্যের মধ্যে অসামন্যের ধারনার জন্ম দেয়। কাব্যে ভাব বা কল্পনায় বিশেষ স্থান আছে। ইতিহাসের অনুকরন হুবহু। তাই ইতিহাস

টিপ্পনী

নিদিষ্ট তথ্যের কথা বলে। দিন কাল সময় পাত্র পাত্রীর নিদিষ্ট থাকে সেখানে কল্পনার জায়গা নেই বললেই চলে। আর কাব্যে কল্পনায় জায়গা নেই বললেই চলে। আর কাব্যে কল্পনা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তাই কবির মনোভূমি সেখানে বড় কথা। কাব্য বলে সর্বজনীন সত্যের কথা। অনুকরন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন - 'যা ঘটে তা সত্য নয়"

কেননা কবির মনোভূমি ক্রিয়াশীল বাস্তব ভূমির থেকে অনেক বেশী সত্য যদিও অ্যারিস্টটলের অনুকরন তত্ত্ব এবং অনুকরন তত্ত্ব সম্পর্কিত ধারনা থেকে কিছুটা পৃথক।

অ্যারিস্টটল ট্রাজেডির তত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে অনুকরনের ধারনায় ট্রাজেডি সম্পর্কে বলেছেন ট্রাজেডি হল গভীর গম্ভির পুর্নাঙ্গ কোন ক্রিয়াশীল বিষয়ের অনুকরন। এ প্রসঙ্গে তিনি অনেক গ্রীক কাব্য নাটকের কথা তুলে এনেছেন। ট্রাজেডিতে এমন অনেক ঘটনা বা চরিত্রের উল্লেখ আছে যার কোন অস্তিত্ব বাস্তব জগতে নেই বললেই চলে। অথচ শিল্প রসিকরা সেই সকল কাব্য নাটক পড়ে আনন্দ লাভ করেন বা রস গ্রহন করতে সমর্থ হন। অর্থাৎ বস্তুজগতে না থেকে ও তা কবি কল্পনার সৃষ্টি ঘটনা বা চরিত্রাবলী আনন্দদায়ক হতে পারে। প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি 'আনথেউস" নাটকের উল্লেখ করেছেন। এবং সেখানে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে এই নাটকে এমন ঘটনাবলী ও চরিত্রাবলী আছে যার সাথে বাস্তবের ঘটনা ধারার কোন মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ এই নাটকের ঘটনা ও চরিত্র সবই কল্পিত। অথচ অ্যারিস্টটল এগুলিকেও অনুকরন বলেছেন। যা পাঠককে 'কাব্য সত্যের বোধে" পৌঁছে দেয়।

প্লোটো অনুকরনকে শিল্পসৃষ্টির "মূল লক্ষ্য" বলে অভিহিত করেন। কিন্তু অ্যারিস্টটল এর সম্পূর্ন বিরোধিতা করে বলেন, অনুকরন শিল্প সৃষ্টির "উপায়মাত্র"। শিল্প সৃষ্টির মূল লক্ষ্য হল অভিনব রূপের নির্মান।বস্তু জগৎ যে অপূর্নতা আছে শিল্পের জগৎ তা পুর্ন করে। অর্থাৎ প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বর্ধনের একটি উপায় শিল্পসৃজন।

'পোয়েটিকস্' গ্রন্থে অ্যারিস্তটল অনুকরনের তিনটি শ্রেনীবিভাগ করেছেন -

(১) বাস্তবের থেকে উৎকৃষ্ট - যা ট্রাজেডিতে লক্ষ্য করা যায়।

(২)বাস্তবের থেকে নিকৃষ্ট - যা কমেডিতে দেখা যায়।

(৩) বাস্তবের হুবহু অনুকরন।

অভারিস্টটল বাস্তবজীবন সত্যের সচল, সজীব, প্রত্যক্ষতাঁর অআস্থা রেখে দিলেন। ফলে এই গভীর জীবন চেতনা থেকেই তাঁর কাব্যতত্ত্বের মতামত উঠে এসেছে। তাই অ্যারিস্টটলের মতানুসারে - "কবির আনুকরনের বিষয় মানুষের 'কর্মবৃত্ই'। যা পোয়েটিকস্ গ্রন্থের বারবার ধরাপড়েছে। ফলে অ্যাইস্টটলের কাছে অনুকরন যান্ত্রিক দাসত্ব নয় ; মানবিক সৃজনশীলতাঁর নামান্তর। অনেক সময় বিষয় বা মাধ্যম এক হয়েও শিল্পীর নিজস্বতাঁর কারনে তা স্বতন্ত্র্য হয়ে ওঠে। অ্যারিস্টটলের মতে 'অনুকরনরীতিই শিল্পীকে স্বতন্ত্র করে। জীবনের মহত্তম দিক যখন ফুটিয়ে তোলা হয় এবং তাঁর সাথে যদি জাতীয়তাঁর যোগ থাকে তখন তা হয়ে উঠে মহাকাব্য। মানবজীবনের রূপবৈচিত্রকে সংলাপের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুললে তা হয় নাটক। আর মানব জীবনের অনুভূতিবা উপলব্ধি যখন ছন্দময় ভাষায় প্রতিফলিত হয় তখন তা কাব্য হয়ে ওঠে। অর্থাৎ বলা যায় বিষয় বা মাধ্যম এক হলেও তা অনুকরনে প্রকৃতির জন্যই আলাদা শিল্প হয়ে ওঠে। পোয়োটিকস্ গ্রন্থে অনুকরন তত্ত্বটি এভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন অ্যারিস্টটল।

টিপ্পনী

ট্রাজেডির স্বরূপ

পোয়েটিকস্ গ্রন্থের প্রায় বারো আনা স্থান অধিকার করে আছে ট্রাজেডির আলোচনা। পোয়েটিকস্ গ্রন্থ অনুসারে ট্রাজেডির আলোচনাকে নিম্নলিখিত ভাবে উপস্থাপনা করা যেতে পারে-

(ক) গ্রীক ট্র্যাজেড়ির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ।

(খ) ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা।

(গ) ট্র্যাজেডির বিষষবস্তু বা উপাদান।

(ঘ) ট্র্যাজেডির নায়ক।

(ঙ) ট্র্যাজেডির রস।

(চ) ট্র্যাজেডির পরিনতি।

(ছ) ট্রাজেডির শ্রেনীবিভাগ

(ঝ) ট্রাজেডি ও মেলোড্রামা।

টিপ্পনী

(ক) গ্রীক ট্র্যাজেডির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

গ্রীকে "ডাওনিসান" উৎসবে 'ডিথিরাম' গীতি থেকে ট্র্যাজেডির উদ্ভব হয়েছে বলে অ্যারিস্টটল মনে করেন। অ্যারিস্টটলের সিদ্ধান্ত ট্র্যাজেডি - "Originated with the authors of the Dithyrumb"। গ্রীক ট্র্যাজেডির আলোচনা করতে গিয়ে এই স্কিলাস পাত্রের সাথে সংলাপের প্রাধান্য দান করেন। সফোক্লিস পাত্রের সংখ্যা বাড়িয়ে কাহিনী বা বৃত্তের আকার বড় করেন। তবে ট্র্যাজেডির উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে অ্যারিস্টটল যে তথ্য দিয়েছেন তা আজও সর্বজন স্বীকৃত।

(খ) ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা

'পোয়েটিকস্' গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ট্র্যাজেডির সংজ্ঞায় অ্যারিস্টটল বলেছেন - "Tragedy, then is an imitation of an action that is serious and complete in itself, having certain magnitude, hot in a narrative form but in action, with pleasurable accessories, arousing pity and fear, and here with it accomplishes to cathersis." অর্থাৎ"ট্রাজেডী হল একটি গম্ভির সম্পূর্ন ও বিশেষ আয়তন বিশিষ্ট ক্রিয়ার অনুকরন ভাষার সৌন্দর্যে তাঁর প্রতিটি অঙ্গ স্বতন্ত্র, এই ক্রিয়াটির প্রকাশ রীতি বর্ণনাত্মক নয়, নাটকীয়, আর এই ক্রিয়া ভীতি ও করুনার উদ্রেক করে এবং তাঁর মধ্যে দিয়ে অনুরূপ অনুভূতিগুলির পরিশুদ্ধি ঘটায়।"

ট্র্যাজেডির উক্ত সংজ্ঞাটি বিশ্লেষন করলে যে সূত্র গুলি উঠে আসে, তা -

(১) 'গুরুগম্ভীর অর্থাৎ গাম্ভীর্যপূর্ন বিষয়কে নিয়েই ট্র্যাজেডির রচিতহবে। লঘু বা হালকাকে বিষয় ট্র্যাজেডিতে থাকে না।

(২) ট্র্যাজেডির কাহিনী আদি-মধ্য -অদন্ত্য যুক্ত পূর্নাঙ্গ ও পরিমিত আয়তন বিশিষ্ট হবে।

(৩) ট্র্যাজেডি ঘটনা রচিত হয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বর্ণনামুলক নয়।

(৪) ট্র্যাজেডি ভাষা গাম্ভীর্য পূর্ন। ছন্দ, অলঙ্কার, শব্দ, যোজন, সঙ্গীত প্রভৃতির সুললিত প্রয়োগ থাকবে।

(৫) ট্র্যাজোডি পাঠক বা দর্শকের মনে করুনা ও ভয় (Pity and fear) জাগিয়ে তুলে আবার তাঁর 'ভাবমোক্ষন' (Cathersis) বা 'চিত্ত পরিশুদ্ধি' ঘটান।

(গ) ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু বা উপাদান

'পেয়োটিকস' গ্রন্থানুসারে ট্র্যাজেডির উপাদান হল ছয়টি , যথা - কাহিনী বা বৃত্ত (Plot); চরিত্র (Charecter); রচনারীতি (Diction) ; অভিপ্রায় বা ভাবনা (Thought), দৃশ্যসজ্জা (Spectacle) ও সঙ্গিত (Melody)। এই জন্য ট্র্যাজেডিকে অনেকে ষড়ঙ্গ শিল্প বলেছেন।

টিপ্পনী

কাহিনী বা বৃত্ত (plot) :

অ্যারিস্টটল ট্র্যাজোডির আলোচনায় কাহিনীকে সবথেকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। গ্রিক 'মুথোস' শব্দের বাংলা হল কাহিনী বা বৃত্ত। কাহিনী মধ্য দিয়েই মানবজীবনের ঘটনা ধারার তুলে ধরেন শিলপী। অ্যারিস্টটলের মতে ট্র্যাজেডি মানুষের অনুকরন নয়, মানবজীবনের কোন ক্রিয়ার অনুকরন। জীবনের সুখ বা দুঃখ বহু ঘটনার (Serious action) অনুকরন। কাহিনির মধ্যে আয়তন, সমগ্রতা, ঐক্য, বিপ্রতাপতর, গ্রন্থমোচন, উপকাহিনী সবই থাকে । তাই ট্র্যাজেডির আলোচনায় কাহিনীই হল সবথেকে বেশী গুরুত্বপূর্ন।

চরিত্র (Charecter) :

ঘটনাকে যথাযথ রূপ দিতে গেলে প্রয়োজন হয় চরিত্রের। তবে কাহিনীর সাথে চরিত্র ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। তাই চরিত্রকে বাদ দিয়ে ট্র্যাজেডি সম্ভব নয়। তবে চরিত্র হবে সূক্ষ্ম আর ট্র্যাজেডির নায়ক হবেন, উচ্চবংশ জাত, বীর, মহান, ওজস্বী ও ক্ষমতা সম্পন্ন। তবে তিনি অত্যন্ত ধার্মীক ব্যাক্তি হবেন না।

রচনারীতি (Diction) :

অ্যারিস্টটললের মতে রচনারীতির বিন্যাসে শৈলিক দক্ষতা প্রয়োজন। ঘটনা ধারার যথাযথ উপস্থাপায় চমৎকারিত্ব দরকার। ব্যকরনের যথাযথ নিয়মনীতি, ছন্দের ব্যবহার অলংকার প্রয়োগের দক্ষতা প্রনয়ন, উপমার সৌকর্য ইত্যাদির যথাযথ প্রয়োগে রচনা গাম্ভীর্যপুর্ন হয়ে ওঠে।

অভিপ্রায় বা ভাবনা (Thought) :

ট্র্যাজেডির আলোচনায় অভিপ্রায় বা ভাবনা একটি গুরুত্বপূর্ন অংশ। কারণ

ট্র্যাজেডির কাহিনির মধ্য দিয়ে রচয়িতা আসলে কি বলতে চাইছেন ; সেটাই হল অভিপ্রায় ; এই অভিপ্রায় বা ভাবনা ট্র্যাজেডিকে শিল্পের চরম শিখরে পৌঁছে দেন।

দৃশ্যসজ্জা (Spectacle) :

টিপ্পনী

দৃশ্যসজ্জা ট্র্যাজেডির কাহিনীকে আকর্ষনীয় করে তোলে নাটকীয় ক্ষেত্রে দৃশ্যের পরম্পরা কাহিনীকে অভিনব রূপে গড়ে তোলে। তবে ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে দৃশ্যসজ্জার গুরুত্ব তুলনামুলক ভাবে কম বললেই চলে।

সঙ্গিত (Melody) :

অ্যারিসটটলের মতে "অন্যান্য উপাদানের মধ্যে ট্র্যাজেডির সবচেয়ে প্রীতিকর উপাদান হল সঙ্গিত।" তবে সঙ্গীত বলতে অ্যারিস্টটল "নাটকে ব্যবহৃত ধ্বনিসমূহের নিয়ন্ত্রিত বিন্যাস" কে বুঝিয়েছেন। যার মধ্যে সুর থাকবে। আমাদের ধারনা অনুযায়ী সঙ্গীত হল 'গান'। অ্যারিস্টটল 'গান' কে অর্থে বোঝাতে চান নি।

অ্যারিস্টটলের মতে ট্র্যাজেডি হবে অভিনীত। যা দেখে দর্শকরা সহজের ট্র্যাজেডির রস গ্রহন করতে পারবে। সেই সাথে চোখের সামনে ঘটা দৃশ্য দেখে দর্শকের শ্রুতিতে melody ধরা পড়বে। ফলে ট্র্যাজেডি রচনা সার্থক হবে।

ক্যাথারসিস (Cathersis)

পোয়েটিকস্ গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ট্র্যাজেডির সংজ্ঞায় অ্যারিস্টটল বলেছেন - "Through pity and fear effecting te proper purgation of these emotion" - মূলত ট্রাজেডি নাটক দর্শনে দর্শকের অন্তরে করুনা ও ভীতি জাগ্রত হয়। নাট্যকারের সেই জাগ্রত করুনা উভয়ের প্রশমন অর্থে 'ক্যাথারসিস' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অ্যারিস্টটল ব্যবহৃত এই ক্যাথারসিস শব্দটি বহু বিতর্কিত।

অ্যারিস্টটলের মতানুসারে ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য ভাব বিলোক্ষন (Cathersis)। এই ক্যাথারসিস সম্পর্কে অ্যারিস্টটল বিশেষ কিছু বলেননি। তবে পরবর্তী কালে ক্যাথরসিস শব্দটি নিয়ে বহু চর্চিত হয়েছে। পোয়েটিকস্ এর অনুবাদকরা ক্যাথরিসিস শব্দের দলে কেউ কেউ "Purgation' কেউ বা ' Purification' প্রকৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন। ভাষ্যকার বুচার ক্যাথারিস শব্দটির বদলে 'Purgation' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। বুচারের মতে Purgation ই হল ট্র্যাজেডির মূল উদ্দেশ্য। মিলটন ও এই

শব্দটি ব্যবহার করেছেন। পোয়েটিকস্ গ্রন্থে অ্যারিস্টটল বলেছেন - যে ঘটনার সাথে আমি (Involved) তাই জাগয় Fear যা আমাদের ক্ষতিকরতে পারে। pity এর সাথে আমরা ততোটা Involved নই। জাগতিক নিয়মের বিরুদ্ধে কিছু ঘটলে Pity জাগে। জাগতিক বিধানে বিশ্বাসই Pity জাগায়।

টিপ্পনী

অনেকে আবার ক্যাথারসিস শব্দটি কে চিকিৎসা শাস্ত্রের পরিভাষায় 'মানসিক পরিশোধন' অর্থে ব্যবহার করেছেন, অর্থাৎ ক্যাথরসিস হচ্ছে ট্র্যাজেডির ভয়ানক ও শোচনীয় ঘটনার অনুকরন দ্বারা আমাদের মনে ভয় ও করুনা জাগায়। তধা কু প্রবৃত্তিকে প্রশমিত করে। সেই সাথে সামাজিক ব্যাক্তিদের নৈতিকমান উন্নত করে। অর্থাৎ ভয় ও করুন যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় আনন্দে পরিনত হয় সেই বিশেষ প্রক্রিয়া এটি। অর্থাৎ বলা যায় ক্যাথারসিস একটি শৈল্পিক প্রক্রিয়া। যা ভয় ও করুনাকে দূরীভূত করে আনন্দ প্রদান করে।

অ্যারিস্টটল তাঁর পোয়েটিকস্ গ্রন্থে বলেছেন -"মানুষের মধ্যে কোন একটি আবেগ প্রবল হলে তাকে বের করে দিতে পারলে মানুষ স্বস্তি পাব।" Purgation বাদীরাও এই মত সমর্থন করেন। তাঁরা বলেন - Pity ও Fear এর অপসারনে মনে স্বস্তি আসে ফলে ক্যাথারসিস সৃষ্টি হয়।

অ্যারিস্টটল ক্যাথারসিস শব্দের দ্বারা আসলে কি বোঝাতে চেয়েছেন তা আজও সুনিশ্চিত ভাবে কেউ বলতে পারেননি। তবে বোঝা যায় যে, তীব্রতর আবেগ তাড়িত মনোভাবের মধ্যে থেকে কতকটা আবেগের অপসরন। ফলে আবেগ তাড়িত মানুষের মনে যে প্রশান্তি তাই হল 'ক্যাথারসিস'।

১৯ শতকের রোমান্টিক কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ এর বক্তব্য অনুযায়ী ক্যাথারসিসের ফলে কবিতা পাঠক বিনীত হয়, মানবিক হব, মিথ্যা অভিজাত্যের বোধ ও উন্মাসিকতা বোধ থেকে মুক্তি পায়। কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস থেকে ক্যাথারসিস কবিতাঁর পাঠককে মুক্তি দেয়। বিশ শতকের মনস্তাত্বিক সমালোচক আই এ. রিচার্ডস এর মতানুসারে ক্যাথারসিস ই হচ্ছে একমাত্র উপায় যাতে কোন রকম অবদমন ছাড়াই আমাদের জাগ্রত প্রবৃত্তি গুলি বিশ্রান্তির সুযোগ পায়।

ক্যাথারসিস সম্পর্কে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আলংকারিক এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টি কোন কে বোঝা যায় যে, যে কোন প্রকার রসোত্তীর্ন রচনাই শোচনার উদ্রেক করে,

পরে তা আনন্দের হেতু হয়। তাই বলা যায় ট্র্যাজেডির আনন্দ শুধু বিশুদ্ধ শিল্প সম্ভোগের নয়, নানা কারনেই এই আনন্দলাভ করা যেতে পারে। সহৃদয় দর্শকচিত্তে রসোদ্রেকের ফলে যে আনন্দ তাকে মিথ্যা বলা যায় না।

টিপ্পনী

প্লেটোর মতানুসারে সাহিত্য- শিল্প মানুষকে বিপথগামী করে। এরই প্রতিবাদে অ্যারিস্টটল ক্যাথারসিস শব্দটি প্রয়োগ করে দেখাতে চেয়েছেন যে সৎসাহিত্য মানুষকে বিপথগামী বা কলুষিত করে না বরং তাঁর মলিনতা দূর করে, তাকে উচ্চমার্গে নিয়ে যায়। তাই বলা যাব - অ্যারিস্টটল ক্যাথারসিস শব্দটিকে মানষিক পরিশোধন, নৈতিক উন্নয়ন চরিত্র সংগঠন বা ভয় ও শোচনার পরিনমন এর কোন অর্থেই ব্যবহার করেন নি। রেচন বা উৎদ্রেক অর্থেই তিনি শব্দটিকে প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন - ভয়ানক ও শোচনীয় ঘটনাকে এমনভাবে উপস্থাপিত করতেহবে যাতে দর্শকদের মনে ভয়ের শিহরন এবং শোচনার দ্রবন উপস্থাপিত হয়। যাতে 'ভয়' 'শিহরনের মাত্রায়' এবং 'শোচনা' 'দ্রবীভাবের মাত্রায়' পৌঁছায়। এই মাত্রায় পৌঁছনোর নামই "Proper purgation of these emotions" -এই হিসাবে ক্যথারসিস শব্দটি রসনিষ্পত্তির মাত্রা নির্দেশ করার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। ক্যথারসিস আসলে ভাবমোক্ষনে সমৃদ্ধ।

পেয়োটিকস গ্রন্থে সাহিত্য সমালোচনা সূত্র

অ্যারিস্টটল গ্রীসের প্রথম 'সাহিত্য শাস্ত্র' কার হলেও প্রথম সাহিত্য সমালোচক নন। এর আগে সমালোচক সম্পর্কে সাহিত্যিকদের ভীতির উল্লেখ পাই Plato-র 'Republic' গ্রন্থে-

"Critics jumped at certain groundless conclusion, they pass adverse Judgement and then prosed to reason on it; and assuming that the poet had said whatever they happen to think, find fault if a thing is inconsistent with their own fancy." - অর্থাৎ খাঁটি সমালোচক অবশ্যই হবেন বিপরীতধর্মী। যুক্তিহীন হঠাৎ কোন সিদ্ধান্ত তিনি করেন না। কোন ব্যাপারে নিজের অনিমানকে তিনি প্রশ্রয় দেবেন না। এইসব সমালোচকদের হাত থেকে কবিদের মুক্তি দেওয়ার জন্য Aristiatle তাঁর Poetics গ্রন্থে সমালোচনা সম্পর্কে কিছু অভিমত ব্যক্ত করেন।

সাহিত্য সমালোচনা সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের বক্তব্য খুবই সীমিত। তবে দোষ ত্রুটি নির্দেশ সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের সমালোচনা অনেক ব্যাপক ও স্পষ্ট। তাঁর মতে দোষ কোন কোন অবস্থায় গুন হতে পারে। দোষ সম্পর্কে তাঁর গুরুত্ব পূর্ন সিদ্ধান্ত - "Within the art of poetry if self there are two kinds of faults those which touch its essence and those which are accidental." - অর্থাৎ তাঁর মতে দোষ দুই প্রকার। এক - আত্মিক দোষ যে দোষ শিক্ষার আত্মাকে কলুষিত করে। অর্থাৎ কবি যখন কোন বিষয়কে উপস্থাপিত করতে গিয়ে কবিত্বশক্তির অভাবে তা যথাযথ ভাবে উপস্থাপনা করতে পারেন না, রূপদিতে গিয়ে ভুল করেন, তখন বুঝতে হবে ভুলটি মর্মগত। দুই - আপাতিক দোষ = যেখানে উপস্থাপ্য বিষয় নির্বাচনের ভুলের জন্য দোষ দেখা দেয়, অন্যান্য শিল্পের বা বিজ্ঞানের সূত্র সামগ্রি প্রয়োগের ত্রুটি দেখা দেয়, সেখানে দোষ বাহ্য (Accidental)। সমালোচককে এই ত্রুটি গুলি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

টিপ্পনী

অ্যারিস্টটলের মতে মোটামুটি পাঁচটি দোষের জন্য সমালোচকরা রচনাকে নিন্দা করে থাকেন -

(ক) Impossible বা অসম্ভব

(খ) Irrational বা অবিশ্বাস্য

(গ) Morally hurtful বা নীতি - বিগর্হিত

(ঘ) Contradictory বা স্বতোবিরুদ্ধ

(ঙ) Contrary to artistic correctness বা অসঙ্গত

অ্যারিস্টটলের মতে এই দোষ বা ত্রুটিগুলি অমার্জনীয় অপরাধ নয়। কারন যে কোন সাহিত্য স্রষ্টাই এই দোষগুলি বর্জন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু শিল্পে প্রয়োজন এই ত্রুটি ঘটলে, তা দোষের হবে না। অবশ্য অন্য উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে "অসম্ভব"। প্রয়োগ দোষ বলেই তা গন্য হবে। দোষটি নিত্য বা অনিত্য তাই বিবেচনা করে দেখতে হবে।

Publicity সম্পর্কে অ্যারিস্টটল তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন -

(i) Things as they were or are

টিপ্পনী

(ii) Things as they are said or thought to be

(iii) Things as they ought to be

অ্যারিস্টটল বাস্তব ও অবাস্তব সমস্যার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, কবিদের মধ্যে বাস্তব প্রবনতা এবং আদর্শ প্রবনতা দুটোই থাকতে পারে। কবি বাস্তবকে অনুকরন না করে বস্তু সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য অনুকরন করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে বস্তুবাদ আর আদর্শ বাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। তিনি বিশিষ্ট কবিদের নিয়ে আলোচনা করে দেখিয়েছেন সফোক্লিসের মধ্যে ছিল আদর্শ প্রবনতা, আর ইউরিপি ডিসের মধ্যে ছিল বাস্তব প্রবণতা। অসম্ভব (Impossible) কে দোষ দিতে গেলেকোন বিষয় এবং কিভাবে রূপ দিচ্ছেন এটাও লক্ষ্য রাখা দরকার।

Irrational বা অবিশ্বাস্য সম্পর্কে অ্যারিস্টটল বলেছেন - "The element of the irrational and similarly depravity of character are justly censured when there is no inner necessity for introducing them." - অর্থাৎ শিল্পের প্রয়োজনে কোন নীতি - বিগহিত চরিত্র বা অযৌক্তিক বা অবিশ্বাস্য কোন প্রসঙ্গ এসে থাকে তবে সেক্ষেত্রে তাকে ত্রুটি বলা যাবে না। উদাহরন স্বরূপ তিনি হেক্টরের পশ্চাদধাবন ঘটনাটির কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এই অসম্ভব ব্যাপারতি চিত্তাকর্ষক হলে রূপ দেওয়া যায়, নইলে অসম্ভব বস্তুকে রূপ না দেওয়াই উচিত, এটি মঞ্চে দেখানো কখনো সম্ভব নয়। তিনি শিল্পের সঙ্গে নীতি কে মিলিয়ে ফেলেননি, শিল্পের মানদন্ডে নীতির প্রসঙ্গটি বিচার্য বলে মনে করেন। এখান থেকেই পরবর্তীকালে সাহিত্য সমালোচনার দুটি ধারা গড়ে ওঠে -

(ক) Art for Arts Shake

(খ) Art for life Shake

স্বতো বিরোধী বা অসঙ্গত আচার আচরণের ক্ষেত্রে আচার ও উক্তির ঔচিত্য বিচার করতে গেলে তাদের অবিচ্ছিন্ন ভাবে দেখতে হবে। সমস্ত পারম্পর্য বিশেষ অবস্থা ও উদ্দেশ্য বিচার করে ঔচিত্যের প্রশ্নটি বিচার করতে হবে। এখানে অ্যারিস্টটল উদারতা মনোভাবাপন্ন মত প্রদান করেছেন।

ট্রাজেডির ৬টি উপাদান যথা (ক) বৃত্ত (plot) (খ) চরিত্র (Character, (গ) ভাষা (Diction) (ঘ) IQ চিন্তা (Thought) (ঙ) দৃশ্য (Spcetacle) (চ) সঙ্গিত

(Melody) , সম্পর্কে অ্যারিস্টটল যথাযথ মত প্রদান করেছেন। সেখানে Plot বা বৃত্তের গঠনে ঐক্য থাকতে হবে। চরিত্রের ক্ষেত্রে ঔতিহ্য বজায় আছে কিনা তা দেখতে হবে। বাচন বা চিন্তাসম্পর্কে তিনি বলেন প্রচলিত ও উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করতে হবে যাতে বক্তব্য বিষয় স্পষ্ট হবে, ছন্দ, শব্দ, অলঙ্কার প্রয়োগের ও ঔচিত্য বজায় রাখা প্রয়োজন। আর সঙ্গীত ও দৃশ্যসজ্জা সম্পর্কে তাঁর ধারনা এগুলি যেন নাটকের রস সৃষ্টিতে যথাযথ হচ্ছে কি না তা দেখতে হবে।

টিপ্পনী

অ্যারিস্টটলের সমালোচনায় সীমারেখায় উঠে আসে শিল্প কর্মের বিচার বিশ্লেষন হবে যুক্তি গ্রাহ্য এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ। কাব্য সমালোচনা হবে ব্যাক্তিগত প্রতিক্রিয়ার প্রভাব মুক্ত। এবং তাত্ত্বিক কাঠামোটি পরিবর্তন সাপেক্ষ। নতুন শিল্প কর্মের সাথে নিজেকে প্রসারিত করতে হবে। অ্যারিস্টটলের কাঠামোর এই অসাধারন স্থিতি স্থাপকতা (Causticity) Poetics গ্রন্থের একটি মহত্ত্বর দিক।

মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডির সম্পর্ক

অ্যারিস্টটল তাঁর 'Poetics' গ্রন্থের ২৩ থেকে ২৬তম অধ্যায়ে মহাকাব্য সম্পর্কে বিস্তাঁরিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মহাকাবের ধারায় যে বৈশিষ্ট্যগুলি উঠে আসে তা হল-

(১) মহাকাব্যে থাকে আদি-মধ্য-অন্ত্য সমন্বিত একটি স্বয়ং সম্পূর্ন কাহিনী তবে Unity of Action রক্ষা করাই মহাকাবের উদ্দেশ্য।

(২) মহাকাব্যের ঘটনা হবে গুরুগম্ভীর।

(৩) মহাকাব্যের নায়ক হবেন সৎ, উচ্চবংশ জাত, ধীর, বীরোদ্দাতht, তবে নায়ক অতি ধার্মিক ব্যাক্তি হবেন না।

(৪) মহাকাব্যের অবয়ব অনেক বড়ো হবে।

(৫) বর্ণনাত্মক ভাষায় মহাকাব্য রচিত হবে।

(৬) মহাকাব্য নিদিষ্ট কালসীমা না থাকায় বহু উপন্যাস এখানে অনায়াসে স্থান করে নেয়।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য গুলি প্রায় সবই ট্র্যাজেডিতে আছে। তবে মহাকাব্যের সাথে যদি ট্রাজেডির আলোচনা করা যায় তবে সে ক্ষেত্রে অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডিকেই

টিপ্পনী

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলে অভিহিত করেছেন। কারণ ট্র্যাজেডি ষড়ঙ্গ শিল্প। সেখানে Plot, character, Thought, Diction, Spectacle ও Melody এই ছয়টি অঙ্গ সুস্পষ্ট রুপে প্রতিভাত। আর মহাকাব্য চতুরঙ্গ শিল্প। সেখানে Plot, character, Thought, Diction, Spectacle ও Melody র কোন স্থান নেই। তাছাড়া ট্রাজেডিতে ছন্দো বৈচিত্র্য বর্তমান কিন্তু মহাকাব্যের একটি স্বর্গ একটি নিদিষ্ট ছন্দো লিখতে হয়। কবি যদি মনে করেন তবে অন্য সর্গে গিয়ে ছন্দ পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। মহাকাব্য দীর্ঘ হওয়ায় অনেক সময় কাহিনী ঐক্য শিথিল হয়ে পড়ে। এই সমস্ত কারনে মহাকাব্যের থেকে ট্রাজেডি উৎকৃষ্ট । 'Tragedy is better than Epic' । এভাবে অ্যারিস্টটল মহাকাব্যের থেকে ট্র্যাজেডিকে শ্রেষ্ঠত্ব বলে প্রতিপন্ন করেছেন।

কোরাস

পোয়েটিকস্ গ্রন্থের ১৮তম পরিচ্ছেদে কোরাস সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। কোরাসের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে - "কোরাসকে একজন অভিনেতা হিসেবে গন্য করতে হবে। কোরাস হবে সমগ্র নাটকের একটি উপাদান, নাটকের ক্রিয়াতে অংশ গ্রহন করবে - ইউরিপিদিসের নাটকের মতো নয়, সফোক্লিসের নাটকের মতো।"

ট্র্যাজেডি আলোচনায় অ্যারিস্টটল সঙ্গীতকে নাটকের অন্যতম উপাদান বলেছেন। ট্রাজেডি নাটকের গতিকে ত্বরান্বিত করতে বা নাটককে আরো বেশী প্রানবন্ত বা আনন্দ দায়ক করে তুলতে গেলে সঙ্গীতের প্রয়োগ জরুরী। অ্যারিস্টটলের মতে -

"Melody is the greatest of the Pleasurable accessaries of tragedy."

কোরাস সঙ্গীত রূপেই বিবেচিত হয়। তবে অ্যারিস্টটলের ধারনায় কোরাসের গুরুত্ব আরো বেশী Poectic গ্রন্থের কোরাসের গুরুত্ব আলোচনায় অ্যারিস্টটল বলেছেন -

"The Chorus too should be regarded as one of the actors it should be an in integral part of the whole and shage in the action."

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে কোরাস নাটকের একটা অংশ রূপেই গন্য, অপ্রাসঙ্গিক

ভাবে বা অনুগত্যের জন্য কোরাসকে আনা চলবে না। কোরাসকে নাটকের অন্যতম এক অভিনয় হিসাবে মনে করতে হবে। নাটকের সঙ্গে কোরাসের থাকবে আত্মিক যোগসূত্র। গ্রীক নাটকের উদ্ভব হয়েছিল এই কোরাস গীতি থেকে। পরবর্তীকালে কোরাস ই ট্র্যাজেডি নাটকের অবয়ব ধরন করতো, এতে একজন বা দুজন অভিনেতা নাটকের কাহিনী প্রসঙ্গকে বুঝিয়ে দিত। নাটকের প্রস্তাবনার শেষে কোরাস প্রবেশ করতে এবং তাঁরা দু দলে বিভক্ত হয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করতো। সেই সাথে নাটকে যে নীতি মুলক ভাব ধারাটি প্রকাশিত হয় তা প্রকারন্তে কোরাসই প্রকাশ করে কোরাস থেকেই গ্রীক ট্র্যাজেডির উৎপত্তি। নাটকে কোরাসের প্রধানত দুটি কাজ। যথা -

টিপ্পনী

(ক) কোরাসের দ্বারা সমস্ত অভিনয়টি একটি ধর্মীয় সুষমা লাভ করে। নাটকের মধ্যে যে নৈতিক সত্য ও পবিত্র ভাবের ইঙ্গিত আছে তা কোরাসের মাধ্যমে ফুটে উঠত।

(খ) কোরাসের ভাষা কাব্যময় হওয়ায় নাটকের চরিত্রগুলির কথাবার্তায় একটি সারল্য ও অনাড়ম্বর ভাব প্রকাশ পেত।

কোরাসের সংখ্যা সম্পর্কে যে তথ্য জানা যায় -

"প্রায় প্রতি নাটকেই পঞ্চাশজন করে কোরাস থাকত। আর এই পঞ্চাশ জনকে কোন কোন নাটকে নাচতে ও হত। তাঁর ফলে অভিনয় করবার জন্য বিরাট একটা জায়গার প্রয়োজন হত। মোট ত্রিরিশ হাজার দর্শকের জন্য আয়োজন থাকত।" (নাটকের জন্মকথা বোলান গঙ্গোপাধ্যায়, সাক্ষরতা প্রকাশন, বোথোদয় গ্রন্থমালা, পৃ - ২৭)।

যদিও পরবর্তী কালে কোরাসের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। সফোক্লিসের যুগে কোরাসের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র পনের জন। বর্তমানে তা দু'জন বা একজনে এসে দাঁড়িয়েছে।

কমেডি

অ্যারিস্টটলো তাঁর Poetics গ্রন্থের ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ে কমেডির উদ্ভব ও ক্রম বিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন। ট্র্যাজেডিতে উচ্চতর মানুষের জীবনের অনুকরন করা হয়। কিন্তু কমেডিতে ফুটে তবে নিম্নতর মানুষের জীবন চিত্র কমেডিতে মূলত মানুষের জীবনের ত্রুটি বিচ্যুতি গুলি ধরা পড়ে। চরিত্রের অসঙ্গতির কারনে যে হাসির

টিপ্পনী

উদ্রেক ঘটে তাই কমেডি।

পোয়েটিকস্ গ্রন্থের ৫ম অধ্যায়ে কমেডির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে - "As for comedy, it is (as has been observed) an imitation of men worse that the average ; worse, how ever not as regards any and every sort of fault, but only as regards one particular kind, the Ridiculous may be defined as a mistake or deformity not productive of pain or harm to others".

উপরিউক্ত সংজ্ঞা থেকে কমেডির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা যেতে পারে -

(১) কমেডিতে নিম্নতর মানুষের জীবনের অসঙ্গতির দিকটি ধরা পড়ে। এখানে নুম্নতর মানে খারাপ নীচ ব্যাক্তি নয়। স্থূল বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ।

(২) হাস্যরস সৃষ্টি করাই কমেডির উদ্দেশ্য। মানুষের চরিত্রের ছোট ছোট অসঙ্গতিকে সামনে রেখে কমেডি রচয়িতাঁরা হাস্যরস সৃষ্টি করেন।

(৩) কমেডির চরিত্ররা নিজেদের অসঙ্গতিকে ধরতে পারেন না। তাদের ঠিক সিদ্ধান্ত অন্য লোকের কাছে অস্বাভাবিক ও হাস্যপ্রদ হয়ে ধরা দেয়।

অ্যারিস্টটল তাঁর পোয়েটিকস্ গ্রন্থে ট্র্যাজেডির আলোচনা প্রসঙ্গে কমেডির কথা তুলে ধরেছেন। কমেডির জন্য আলাদা ভাবে কোন আলোচনা তিনি করেন নি।

কমেডি মূলত অসঙ্গতিজনিত ঘটনার নাট্যরুপ। এই অসঙ্গতি মানবজীবন কেন্দ্রিক। সাহিত্যিকরা মানব জীবন থেকে উপাদান গ্রহন করে তাদের সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনা করেন। কমেডিও সেই মানব জীবন কেন্দ্রিক তা এখানে জীবনের অসঙ্গতি বড় কথা। এবং অসঙ্গতি জনিত হাস্যরস সৃষ্টিই হল কমেডির উদ্দেশ্য।

আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিকস্' গ্রন্থে 'অনুকরন' বা 'মাইমোসিস' সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা আলোচনা কর।

২। প্লেটোর 'মাইমোসিস' ধারনার সাথে অ্যারিস্টটলের 'মাইমোসিস' বা 'অনুকরনের' ধারনার পার্থক্য দেখাও।

৩। অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস্ গ্রন্থানুসারে ট্র্যাজেডির স্বরূপ ব্যাখা কর।

৪। ট্র্যাজেডির উপাদান গুলি কি কি? পেয়োটিকস গ্রন্থানুসারে তা আলোচনা কর।

৫। ট্র্যাজেডির মূল উপাদান বৃত্ত বা Plot এ র বিষয়ে তোমার অভিমত কি?

৬। পোয়েটিকস্ গ্রন্থ অনুসারে ক্যাথারসিস তত্ত্বের পরিচয় দাও।

৭। অ্যারিস্টটল তাঁর পোয়েটিকস্ গ্রন্থে মহাকাব্যের থেকে ট্র্যাজেডিকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন, কেন, ব্যাখ্যা কর।

৮। অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক গ্রন্থ অনুসারে সাহিত্য সমালোচনার সূত্র ব্যাখ্যা কর।

৯। অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস্ গ্রন্থানুসারে কমেডির সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিশ্লেষন কর।

১০। অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস্ গ্রন্থানুসারে গ্রীক নাটকে কোরাসের ভূমিকা আলোচনা কর।

১১। অ্যারিস্টটল তাঁর পোয়েটিকস্ গ্রন্থে চরিত্রের তুলনায় কাহিনীকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন কেন তা যুক্তি দেখাও।

১২। ট্র্যাজেডির নায়ক এর চরিত্র কেমন হবে তা অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস্ গ্রন্থানুসারে ব্যাখ্যা কর।

টিপ্পনী

ঋনস্বীকার

১। কাব্যতত্ত্ব অ্যারিস্টটল, অনুবাদ শিশির কুমার দাশ, প্যাপিরাস, গনেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা-০৪

২। অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স্ ও সাহিত্যতত্ত্ব; সাধন কুমার ভট্টাচার্য, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩

৩। নন্দনতত্ত্বে প্রতীচ্য; ড. সুখেন বিশ্বাস, দেজ পাবলিশিং, কোল-৭৩

৪। সাহিত্য বিবেক, বিমলকুমারমুখোপাধ্যায়, দেজ পাবলিশিং, কোল-৭৩

৫। অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস্ বা সাহিত্যতত্ত্ব, ভবানীগোপাল সান্যাল, মর্ডান বুক এজেন্সী, কোলকাতা

টিপ্পনী

চতুর্থ একক

ক্লাসিসিজ্‌ম

টিপ্পনী

ভূমিকা

সমাজ-সাহিত্য ইতিহাস পাঠে বিভিন্ন আধুনিক ISM বা মতবাদ গুলি বোঝা খুবই জরুরী। এই চতুর্থ এককটি ক্লাসিসিজম, রোমান্টিসিজম, সুররিয়ালিজম প্রভৃতি মতাদর্শ গুলি যে আন্দোলন ঘনীভুত হতে দেখা যায়। স্বাধীন মনোভঙ্গিযুক্ত মানুষেরা বিভিন্ন বাদের প্রবক্তারা কোন নিদিষ্ট জায়গায় বদ্ধ থাকতে পারেন না তাই এই বাদ গুলির উৎপত্তি । প্রতিটি মতবাদের মধ্যে আধো আধুনিক মনোভঙ্গি, নিম্নে তার বিস্তৃত আলোচনা করা হল।

ক্লাসিসিজম (Classicism)

যা চিরকালের শাশ্বত, মৌলিক সর্বজনীন আদর্শে চিহ্নিত তাই Classicism. সাধারণ দৃষ্টিতে যা বস্তুগত, সংহত, অশিথিল, দৃঢ নিয়ম নিষ্ঠ তাকেই আমরা ক্লাসিকাল বলে থাকি। Aulus Gellius classicism শব্দটির দ্বৈতরূপের কথা বলেছে - (A) Scriptor classicus (B) Scriptor Prolatarius. বাংলা ভাষার সাধুভাষার মতো প্রথমদিকে শিক্ষিত সমাজের সাহিত্যের ব্যপ্য বলেছেন আর দ্বিতীয়টি চলিত ভাষার মতো জনসাধারনের বা লৌকিক সাহিত্যরূপ বলে উল্লেখ করেছেন । Scriptor classicus ই - "প্রথম শ্রেনীর শিল্পের গুনধর্ম বা চিররায়ত বলে চিহ্নিত। যা কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ন অর্থাৎ যা মৌলিক, পরিবর্তনহীন ও বিশ্বজনীন। এই শাশ্বতকালের সাহিত্যেই ক্লাসিসিজম এর আদর্শে রচিত।

ক্লাসিক আদর্শ সম্পর্কে জানা যায় এর রীতি স্পষ্ট উচ্ছাসবিহীন সংহত, সংযত একটি আদর্শ। কল্পনা বিরোধ এই ক্লাসিসিজমের রূপ - রস - ছন্দ - তাল - লয় পরম্পরা অপরিবর্তনীয় "এর আদর্শের স্বরূপ বা প্রকৃতি মনস্তত্ত্বিক। তার সাধনার লক্ষ্য প্রজ্ঞাবাদী জীবনদর্শন।"

ক্লাসিসিজমের চরিত্র ধর্ম সম্পর্কে ব্রুনেতিয়ের (Brunettijere) মন্তব্য - "A

টিপ্পনী

Classic is a classic because in his work all the Faculties find their legitimate Function - without imagination overstepping reason, without logic impeding the flight of imagination, without sentiment encroaching the right of good sense, without good sense killing the warmth of sentiment, without the matter allowing itself to be despoled of the persuasive authority it should borrow from te charm of from and without the form ever usurping an interest which should belong only to the matter."

গ্রীক- রোমান প্রাচীন যুগের যে কাব্য নাটক তা ক্লাসিকাল কাব্য। তা প্রাচীন অনুসরন যা চিরায়িত চিন্তা ভাবনা বলতে গিয়ে Classicism সম্পর্কে Stendhal একটি সুন্দর মন্তব্য করলেন - "Classicism the art of the day before."

ক্লাসিসিজম এর জগতে অতীন্দ্রিয়ের কোন স্থান নেই তা সুস্পষ্ট রূপে সাধারণের সামনে প্রতিভাত। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে ও গান যেমন - রামায়ন, মহাভারত প্রভৃতি চিরায়ত Classic সাহিত্য। মহাকাব্য, নাটক সংগীত বিষয়ে প্রাচীন শাশ্বত রুপ-রীতি আদর্শ Classicism.

আধুনিকতা - উত্তর আধুনিকতা

'আধুনিক' শব্দটি ইংরেজি 'Modern' এর প্রতিশব্দ। এই আধুনিক শব্দটি অনেক গুলি বৈশিষ্ট্য বহন করছে। যার দ্বারা নতুন, বর্তমান বা সমসাময়িক কথা বোঝায়। পাশ্চাত্যে নবজাগরনের আলোকপ্রভায় মানুষ যুক্তিবাদের পথে হাঁটল। অষ্টাদশ - ঊনবিংশ শতকে আধুনিকতার উন্মেষ। ঊনবিংশ শতকের অন্তিম লগ্নে ও বিশ শতকের শুরুতে আধুনিকতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শিল্প , সাহিত্য, ভাস্কর্য, সকল বিষয়ে ব্যাক্তিগত সৃজনের জগত গড়ে উঠল যাকে আধুনিকবাদের উন্মেষ বলা যায়। কবিগুরু আধুনিকতাকে সময় নয়, মর্জিকেই বিশেষ জোর দিয়েছেন। যার সময়ে সে আধুনিক চেতনাকালে চেতন্য আধুনিক, ভারতচন্দ্রের কালে ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্তের কালে ঈশ্বর গুপ্ত, রবীন্দ্রকালে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক এবং যা চিরকালীন স্থায়িত্ব পায়।

একটা সময়ের অন্ধতা ত্যাগ করে যখন মানুষ কুসংস্কার ধর্মন্ধতা আচার -

আচরনের বিরুদ্ধে গিয়ে -ব্যাক্তিস্বাধীনতা, শিল্প সাহিত্যে, বিঞ্জানে ব্যক্তিকর্ম কৃতিত্বই আধুনিকতার বিশেষ লক্ষণ। যেমন বাংলায় রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর ঠিক অনুরূপ মেকিয়াভেলি, টমাস রে, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো, কোপারনিকাস, গ্যালিলিও এই আধুনিকতার প্রতিনিধি। সমাজ - রাজনীতি ধর্ম-ব্যাক্তি জীবনে আনল পরিবর্তন, নবজাগরন বিভিন্ন সংস্কার ; আবিষ্কার ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আধুনিকতা প্রতিষ্ঠা পেল। নিকোলো মেকিয়াভেলি হলেন আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের অগ্রগন্য। এই আধুনিকতা সমাজের সমগ্রস্তরে ব্যাপক প্রভাব ফেলল তা আধুনিকীকরণ তত্ত্বে আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

টিপ্পনী

আধুনিকতাকে নতুনভাবে দেখা ও নতুন তত্ত্বের উপরে দাঁড় করাবার চিন্তাই উত্তর - আধুনিক চিন্তা। আধুনিকতার পরিবর্তে পর্যায়ের চিন্তা ভাবনা উত্তর আধুনিকে দেখা গেল। সাহিত্য চর্চা - নাট্যচর্চা, সংস্কৃতি স্থাপত্যে আধুনিকতার সঙ্গে যে ছেদ দেখা দিল এই নতুন চিন্তাই এই সকল ক্ষেত্রে নতুন করে চিন্তাচেতনা প্রতিষ্ঠিত হল। সময়ের পরিবর্তনে নব নব চিন্তা ভাবনার উন্মেষই Departure (ছেদ) তৈরি করেছে। অ্যান্থনি গিডেন্স তার Modernity and Self Identity' গ্রন্থে সাহিত্যিক নান্দনিক, রাজনৈতিক সামাজিক দিক দিয়ে উত্তর আধুনিকতাবাদকে বিশ্লেষন করেছেন।উত্তর আধুনিকতা এক চূড়ান্ত জটিল বিষয় আধুনিকতা এই বিষয় গুলিকে ও চ্যালেঞ্জ জানায়। এই উত্তর আধুনিকতা সামগ্রিক বিষয়ে Grand Narrative (প্রযোজ্য তত্ত্ব) কে অস্বীকার করে "প্রতিষ্ঠান - বিরোধী, সারবিরোধী, স্থানিক সন্দর্ভর ওপর গুরুত্ব দেয়।"

উত্তর আধুনিকতার প্রবক্তারা হলেন - ফুকো, জাঁ ফ্রাসোয়া লিওতার্দে, রোনাল্ড বার্থেস, জাঁ বদ্রিলার্ড প্রমুখেরা।

নারী চেতনাবাদ

নারীর সামাজিক রাজনৈতিক - অর্থনৈতিক জৈব মানসিক অবস্থান বিষবক আলোচনা গবেষনা নারীচেতনাবাদের বিষয়। এসকল বিষয় নিয়ে পঠন পাঠনই মানবী বিদ্যায় আলোচিত হয়। প্রাচীন - মধ্য - আধুনিক যুগে নারীর অবস্থান তার উন্নয়ন ও মমতার দিকে এগোনোর ইতিহাস পাঠ প্রয়োজনীয়। নারীর অধিকার নারী চেতনার জাগরণ ঘটল ঊনবিংশ শতকে। নারীর চেতন লিঙ্গজনিত বৈষম্য হ্রাস, বিনোদন, পদোন্নতি, রাজনৈতিক অংশগ্রহন প্রভৃতি বিষয় পাশ্চাত্যের নারি অধিকারের

শীলমোহর দেওয়া হল।

নারী ও শিশু শ্রমিকদের দুর্দশা নিরশন ও নিরাপত্তা প্রদানের জন্য প্রথম ঊনবিংশ শতকে আইন প্রণীত হয়। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নয় বছরের কম বয়সীদের শ্রমিকের কাজে নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হল। তের বছরের কম, শিশুদের দিনে আটঘন্টার শ্রমকে স্বীকৃতি প্রদান করা হল। ১৮৪২ সালে কারখানা আইনে নারী শ্রমিকের বার ঘন্টা শ্রমের নিয়ম প্রচলিত হল। ১৮৮০ সালে জার্মানিতে শিশু ও নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য আইন চালু হল। ১৮৯০ সালে ফ্রান্সে ও একই আইন জারী হল। শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীকে এগিয়ে আনার প্রয়োজনে ১৮৭০ সালে ইউরোপের কোন কোন দেশে নারী শিক্ষার ব্যবস্থা চালু হল। ১৮৭০ সালে ইংল্যান্ডে 'এলিমেন্টারী এডুকেশন অ্যাক্ট' এর মধ্য দিয়ে সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হল। বিশ শতকে এসে নারীর ভুমিকা বাড়তে থাকে। নারীদের এই চেতনা থেকে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সুসান বি এ্যান্টনি এবং এলিজাবেথ কেডি স্টানটান গড়ে তোলেন 'ন্যাশানাল উইমেন সাফ্রেন অ্যাসোসিয়েন'। লুসি স্টোন এবং হেনরি ব্লাক ওয়েল গড়লেন 'আমেরিকান উইমেন্স সাফ্রেন অ্যাসোসিয়েশন'। এই দুটি সংগঠন ১৮৯০ সালে সংযুক্ত হয়ে গড়ে ওঠে 'ন্যাশানাল আমেরিকান উইমেনস সাফ্রেজ অ্যাসোসিয়েশন'। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে অ্যালিসপল এর নেতৃত্বে 'কংগ্রেসন্যাল ইউনিয়ন' এই সংস্থাই ১৯১৭ সালে 'ন্যাশানাল উইমেন্স পার্টি' নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯১৯ সালে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটল আমেরিকায়, কেন্দ্রিয় আইনসভায় নারী ভোটাধিকার সংক্রান্ত বিল গৃহীত হয়ে ১৯২০ সালে রাজ্যগুলি তাতে অনুমোদন দেয়। এর পূর্বে ১৯১৮ সালে ব্রিটেনের নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে। ১৯৬০ সাল নাগাদ নারী আন্দোলন আর সমানাধিকারে সীমাবদ্ধ রইল না। চিন্তা চেতনা ক্রমবর্ধমান প্রসারিত হতে থাকল। এখান থেকে নারী রা আত্মপরিচয় যৌনমুক্তি ও শৃঙ্খমুক্তির নতুন ভাবনায় পা রাখল। এ ঘটনাগুলি পরবর্তী কালে মানবীবিদ্যা চর্চার উদ্ভবে উদ্দিপকের কাজ করেছে।

পাশ্চাত্য দেশে বিশেষ করে ইউরোপ, আমেরিকার দেশ গুলিতে প্রথম বিশ শতকের ছয়ের দশকে নারী-বিষয়ক সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, নারীর সামাজিক ভুমিকা কর্মসংস্থান বৈষম্য, স্বাস্থ্য, অধিকার নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত। ১৯৭০ - ৭১ খ্রীষ্টাব্দে সানদিয়োগো বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় মানবীবিদ্যার পাঠক্রম শুরু করে। ১৯৮০ তে কেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় মানবীবিদ্যার উপর এম. এ. ডিগ্রী প্রদানের

টিপ্পনী

ব্যবস্থা করে। ১৯৯০ সাল নাগাদ সমগ্র বিশ্বে ৫৮ টি রাষ্ট্রে মানবীবিদ্যা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রে গবেষনা কেন্দ্র, বিদ্যাকেন্দ্র প্রকাশনা বিষয় কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে S. N. D. T কলেজ ৬৮ তম বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রথম মানবী বিদ্যাকেন্দর শুরু করে । ১৯৮৯ সালে যাদবপুর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবীকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী কালে প্রায় উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রে মানবীবিদ্যাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

টিপ্পনী

মানবীবিদ্যার উৎস হিসাবে (ক) মার্কসীয় দর্শন (খ) ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব (গ) উত্তর আধুনিক বিশ্লেষন (ঘ) নারীবাদীসাহিত্য উল্লেখযোগ্য।

মানবীবিদ্যা

"সাহিত্য সংস্কৃতি, সমাজ - বিজ্ঞানচর্চায়, তত্ত্বায়নে একবিংশ শতকে মানবীবিদ্যা এক নতুন ঢেউ এবং এতটাই গুরুত্বপূর্ন যা মনস্তত্ত্ব, সমাজবিদ্যা, নৃতত্ত্ব ঊনবিংশ শতক থেকে বিংশ শতকের পদার্পনে অবদান রাখে । দ্বিতীয়ত উত্তর আধুনিকতাবাদের মতো মানবীবিদ্যা মূল্যনিরেপেক্ষ নয়, পলায়ন মনোবৃত্তি সম্পন্ন ও নয় । অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্তির আধুনিকতাকে প্রতিবাদ জানিয়ে তার দুর্বলতম দিকগুলি চিহ্নিত করে শ্রেনি, বর্ণ, লিঙ্গভিত্তিক শোষন থেকে মুক্ত এক বিশ্ব গঠনের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ মানবিবিদ্যা।"

বাস্তববাদ

বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ইমানুয়েল কান্ট উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তক । আন্তর্জাতিক সম্পর্কই এর মূল বিষয়। এই উদারনৈতিক চিন্তাধারা বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র সহযোগিতা ও আলোচনার মধ্যদিয়ে একটি আদর্শবাদের জন্ম দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আদর্শবাদীদের চিন্তাচেতনার সমালোচনার সূত্র ধরে বাস্তববাদের জন্ম। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বাস্তববাদ খুবই গুরুত্বপূর্ন, বিশেষ করে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ।রাজনীতির বাস্তবভিত্তিক আলোচনা ও দৃষ্টিভঙ্গিই বাস্তববাদ। বাস্তববাদ দুটি শ্রেনিতে বিভক্ত - (ক) ধ্রুপদী বাস্তববাদ এবং (খ) নয়া বাস্তববাদ। বাস্তববাদের আদি অবস্থানকে আমরা ধ্রুপদী বাস্তববাদ বলে গ্রহন করতে পারি। আর যুদ্ধ পরবর্তী বাস্তববাদের যে ভূমিকা বা অবদান ছিল তার দিকে লক্ষ্য রেখে একে সনাতনী বাস্তববাদ বলা যেতে পারে

। সাম্প্রতিক বাস্তববাদ হল নয়া বাস্তববাদ।

বিভিন্ন পরপম্পরা অবলম্বনে বাস্তববাদী তাত্ত্বিকগন হলেন - থুকিডিডিস, মেকিয়াভেলি, জন হার্জ, হেডলে বুল, জর্জ কেনান, নেইবুর.ই.এইচ.কার, H.J মোরগ্যানথাউ প্রমুখ।

টিপ্পনী

রোম্যান্টিসিজম

ক্লাসিসিজম্ বিদ্রোহী এক মনোভাব নিয়ে রোম্যানটি সিজম এর উদ্ভব। ইমোশনাল বিষয়টি Romanticism এ গুরুত্ব পেল। মনোধর্ম Romanticism এবং Classicism ভিন্ন মেরুর। Romanti কথার মধ্যে আছে সূক্ষম ও গভির ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত Comfort. Alex তাঁর The Ideologe of Romanticism বললেন-

"Romanticism is the endeavor, in the face of growing factual obstacles, to retain, or to justify that illumined view of the universe and of human life which is produced by an imaginative fusion of the familiar and the strange, the known and the unknown, the real and the ideal, the finite and the infinite, the material and the spiritual, the natural and the supernatural."

রোমান্টিক (Romantic) চেতনা বস্তুজগৎ থেকে ভাবজগতে বিচরনের রাজ্য। রোমান্টিকের মধ্যে থাকে কল্পরাজ্য, অসংযত, শিথিল এবং যা কিছু ভাবগত সে সকল বিষয়। যেমন রোমান্টিক কাব্যের মধ্যে আমরা লক্ষ করি কবি হৃদয়ের রহস্যময় এক মায়ার জগত।

Romanticism বাদী কবিরা দুর্জ্ঞেয় অসম্ভব্যতার দিকে যাত্রা করেন। রোমান্টিক কবি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ড. ভানুভূষন বাবু মন্তব্য করলেন।

"আমাদের বর্তমান জীবন আমাদের কাছে অনেকখানি স্পষ্ট পরিচিত ও বাস্তব বলে রোম্যান্টিক কবিগন অতীতের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিপাত করতেন এবং সেই রহস্যময় জীবনের মধ্যে আপনাদের কল্পনাকে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত ছেড়ে দিতেন। আমাদের বর্তমান জীবনের মধ্যে ও সৌন্দর্য্য রয়েছে কিন্তু অপরিচয়ের বিস্ময় ও কৌতুহল সেখানে আমাদের প্রতিনিয়ত আকর্ষন করছে। তাই অতীত জীবনের কাহিনী ও

ইতিহাস রোমান্টিক কবিগনকে সৌন্দর্যের কল্পলোকে কল্পনার মায়ালোক সৃজনে সহায়তা করেছে।"

বীয়ার্স (Beers) মনে করেন - "Romanticism means the reproduction in modern art or Literature of the life and thought the Middle Ages."

টিপ্পনী

শিল্প সংগীত সাহিত্যের ক্ষেত্রে রোমান্টিকতাবাদী বা রোমান্টিক মানসিকতার মধ্যে থাকে কল্পনা বিলাস। আবেগময় জগত। বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতি এখানে বজায় থাকে না। যেমন - মধ্যযুগের রোমান্টিক প্রনয়োপখ্যান আধুনিক উপন্যাস ওকাব্যের মধ্যে রোমানসের কল্পনা বিলাস পরিলক্ষিত।

রোমান্টিসিজম (Rromanticism)

রোমান্টিকতার বৈশিষ্ট্য গুলি হল প্রকৃতিপ্রীতি, মানবপ্রীতি, বিদ্রোহসততা, সৌন্দার্যানুভুতি, আধ্যাত্মিকতা, অতীতচারীকল্পনা, বিস্ময়বোধ, আদর্শবাদ, আত্মনিমজ্জন, বেদনাবোধ, অতিপ্রাকৃতের প্রতি অনুরক্তি প্রভৃতি । আর 'রোমান্টিসিজম হল সাহিত্যের এক বিশেষ অভিব্যাক্তি বা প্রবণতা যা কল্পনার পাখায় ভর করে জীবনের নগ্ন বাস্তবতা হতে দূরে বিস্ময় ও কৌতুকহলের রাজ্যে স্রষ্টাকে নিয়ে যায় এবং স্বতন্ত্রপথে স্বেচ্ছাপ্রনোদিত কল্পনা প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেয়। এ জগৎ অন্তর্মুখীন ছায়াচ্ছন্ন এবং ভাববস্তুর আবেগমন্ডিত এবং ব্যঞ্জনাধর্মী।"

রোম্যান্টিউসিজমের বিকাশ সম্পর্কে জানা যায়-

"শেক্সপীয়ার স্পেনসার এবং অষ্টাদশ শতকের ধ্রুপদী সাহিত্যসৃষ্টির মধ্য হতেই রোমান্টিক ভাবধারার স্ফুরণ ঘটে এবং জেমস টমসন, জন ডায়ার, এডওয়ার্ড ইয়ং, উইলিয়মকলিন্স, রবার্ট গে এবং উইলিয়ম ব্লেক প্রমুখ ইংরেজ কবিদের রচনাশ্রয়ী হয়ে ওয়ার্ডস ওয়ার্থ, কোলরিজ এবং শেলীর যুগে পরিপূর্নতা প্রাপ্ত হয়।"

পরাবস্তুবাদ [S U R R E A L I S M] পরাবাস্তুববাদ / অধিবাস্তুববাদ

সম্পূর্ণ আধুনিক চিন্তাভাবনার শিল্পরূপ পরাবস্তুবাদ বা সুররিয়ালিজম। বিশ

টিপ্পনী

শতকে উদ্ভূত এই আধুনিক শিল্পরীতি পরাবস্তুবাদীরা মানুষের অবচেতন মনকে আপাত বিশৃঙ্খল শিল্পে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে। P. Davies surrealism সম্পর্কে অল্পকথায় বললেন - "a mystical world of paradox and surrealism." পরাস্তুবাদ বা অধিবাস্তব বাদ এর উল্লেখ হল - ১৯২৪ সালে Andre Breton প্রকাশিত Manifesto on Surrealism এ বেতোঁ Surrealism আন্দোলনের প্রধান সাঞ্জিক। এই আন্দোলনে - "মানবমনের সম্পূর্ন স্বাধীন প্রকাশ এবং মানবমনের উপর ক্রিয়াশীল সমস্ত শৃঙ্খলা এবং বন্ধনের মুক্তি, মানবমনের স্বতঃস্ফুর্ত প্রকাশকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিশীলিত করে যুক্তি ও বিশ্লেষন, সামাজিক প্রথা ও নৈতিক মূল্যবোধ এবং শিল্প সাহিত্য সম্বন্ধীয় রীতিনীতি প্রর্বর্তন। সুরলিয়্যালিজম প্রবক্তারা এই সব নিয়ন্ত্রককে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে মানবমনের গভীরতল থেকে উৎসারিত নিখাদ অনুভুতিকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন।"

এই Surrealistics কবিদের শিল্পকর্ম আপাদত দৃষ্টিতে মনে হয় অসরলগ্ন, যুক্তিহীন ও পারম্পর্যবিহীন। কিন্তু শিল্পকর্মে শ্রষ্ঠার অবচেতনমনের আত্মপ্রকাশ ঘটানো প্রচেষ্টা দেখা যায়। সুরিয়ালির্স্বরা প্রতীকধর্ম ব্যবহার করেন তার প্রচলিত আদর্শ ও মূল্যবোধকে মানতে চাননা। তাদের সত্যজ্ঞান -

"the study of dreams of hallucination of the practice of automatic writing under the dictation of the sub - concious."

এই Surrealism এর আদর্শ প্রভাবিত কবিরা হলেন - এভিড গ্যাসকয়েন, ডিল্যান টমাস প্রমুখ। চিত্রকলায় এই ভাবধারার বাহক - ম্যাকস আর্নষ্ট (Max Ernst), চিরিকো (Chirico), পিকাসো, ডালি প্রমুখ। বাংলা সাহিত্যে পরাবাস্তববাদের কবি হলেন - জীবনানন্দ দাশ। রুপক প্রতীক উপমা চিত্রকল্প ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সেই মানবমনের অন্তলোকের রহস্যময় জগত তিনি সৃষ্টি করেছেন। যেমন 'বোধ' কবিতায় -

এক রহস্যময় বিপন্ন বিষ্ময়-

"মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয় প্রেম নয় কোন এক বোধ কাজ করে।
আমি সব ছেড়ে

আমার প্রাণের কাছে আসি

বলি আমি এই হৃদেয়েরে

'বেড়াল' কবিতায়

"হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান রঙের সূর্যের নরম শরীরে

শাদা ধাবা বুলিয়ে বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে ;

তারপর অন্ধকারকে ছোট ছোট বলের মতো থাবা

দিয়ে লুফে আনল সে

সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিল।"

এছাড়া, ঘোড়া, বনলতা সেন, সুচেতনা প্রভৃতি কবিতায় ব্যাপক সুরলিয়নিজমের প্রভাব জীবনানন্দ পরবর্তী বিষ্ণু দে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জয় গোস্বামীর কবিতাতেও Surrealism এর প্রভাব বর্তমান।

নিম্নবর্গ [SUBALTERN]

সাম্প্রতিক নারীবাদী আলোচনার মতে নিম্নবর্গ নিয়ে সমাজ, রাজনীতি- শিক্ষা-সংস্কৃতিতে আলোচনার গুরুত্বপূর্ন বিষয় হয়ে উঠেছে । রণজিৎ গুহ 'SUBALTERN' এর প্রতিশব্দ হিসাবে বাংলায় 'নিম্নবর্গ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন' Subaltern শব্দটি ইংরেজি ভাষার শব্দ। ক্যাপ্টেনদের অধস্তন অফিসারদের মুলত Subaltern বলা হয়ে থাকে, প্রকৃতপক্ষে 'Subaltern' শব্দটি সামরিক বিভাগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

সাধারণ ভাবে সামাজিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষকে নিম্নবর্গীয় বা Subaltern বলতে পারি। একথা স্মরণ যোগ্য 'নিম্নবর্গ' (Subaltern) বিষয়টি ইতিহাস চর্চার সাম্প্রতিক ধারা। 'নিম্নবর্গের রাজনীতি ও ইতিহাস বিদ্যার দায়িত্ব' অংশে রণজিৎ গুহ বললেন -

"উচ্চবর্গ বলতে আমি বোঝাতে চাই তাদেরই, ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষকে যারা প্রভুশক্তির অধিকারি ছিল" - আর নিম্নবর্গ বলতে তিনি জানালেন -

টিপ্পনী

টিপ্পনী

"ঔপনিবেশিক ভারতে যারা এই সংজ্ঞা অনুযায়ী উচ্চবর্গের অন্তর্গত, সমগ্র জনসংখ্যা থেকে তাদের বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তারাই নিম্নবর্গ, এর মধ্যে শহরের শ্রমিক ও গরিব, সবোর্চ্চপদের আমলাদের বাদ দিয়ে মধ্যবিত্তের বাকি অংশ, গ্রামের ক্ষেতমজুর, গরিব চাষি ও প্রায় গরিব মাঝারি নিম্নবর্গের মধ্যে।"

Subaltern Studies মূলত নিচুতলার মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে এক অনুসন্ধান।

SUBALTERN

Subaltern এর অর্থ "a commissioned officer under the rank of a captain" এর প্রতিশব্দ হিসাবে Subordinate ব্যবহার করা হয়। 'Subalter' শব্দটি ব্যবহার করেছেন ইতালির দার্শনিক ও কমিউনিষ্ট নেতা আন্তেনি ও গ্রামশির। বহুস্তরীয় সমাজ ব্যবস্থায় Subaltern হল শ্রমিক শ্রেনী। ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে Subarltern studies খুবই গুরুত্বপূর্ন। সমাজে শোষন, বঞ্চনা, দাসত্ব প্রভরতি নিগড থেকে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম নিম্নবর্গের চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এতদিন উচ্চশ্রেনী ভজনা হয়ে এসেছে, আর Subaltern Studies এ নিম্নবর্গের মানুষের চর্চাই প্রধান। রাজনীতি, সমাজনীতির ক্ষেত্রে নিম্নবর্গের চর্চা গুরুত্ব পেয়েছে। তেমনি সাহিত্যে, উপন্যাস, নাটকে সাধারণ মানুষ তাদের সুখ, দুঃখ , আন্দোলন, জীবন সংগ্রামই নিম্নবর্গ চর্চার দৃঢ়ভিত্তি।

ঔপনিবেশিকবাদ

ইউরোপীয় দেশগুলি বিশেষভাবে ইংলক্যান্ড পুঁজিবাদের উত্থানের স্বর্গরাজ্য। পুঁজিবাদের পায়ে পা মিলিয়ে আসল সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের মধ্যে সম্পদের প্রতি আকর্ষন যেমন ছিল তেমনি অন্য রাষ্ট্রের উপর কায়েমি স্বার্থ চরিতার্থের এক প্রক্রিয়া। পুঁজিবাদী মানসিকতাই বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ গড়তে সাহায্য করল। পুঁজি, লগ্নির মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী সত্তদাই সাম্রাজ্যবাদের রসনাকে সিক্ত করেছিল। উপনিবেশ গড়ার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্যের সঙ্গে অন্যান্য দেশের সংযোগ গড়ে উঠল। ধীরে ধীরে ব্যবসাবাণিজ্যের মধ্যদিয়ে শিক্ষা-সংস্কৃতির বিনিময় ঘটল। ঔপনিবেশিকবাদ মনোভাবের ফলে যেমন সম্পদের শোষন অত্যাচারের ইতিহাস ছিল

ঠিক তার বিপরীতে সংস্কৃতির একটা সমীভবন চলছিল। যার ফলে বিজ্ঞান মনস্ক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটল। ব্যবসা বাণিজ্যের পথ ধরে পরিবহন ব্যবস্থা, উৎপাদন ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন সাধিত হল।

Colonialism ঔপনিবেশিকবাদে উপনিবেশিক রীতিনীতি চিন্তা, বাচনভঙ্গি মতাদর্শ স্থান পায়।

টিপ্পনী

আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ক্লাসিসিজমের সংজ্ঞা লেখ? তার বৈশিষ্ট্য গুলির উল্লেখ কর।

২। রোমান্টিসিজমের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচয় প্রদান কর।

৩। নারীচেতনাবাদ সম্বন্ধে যা জান তা লেখ।

৪। পরাবাস্তব বাদের পরিচয় দাও।